৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

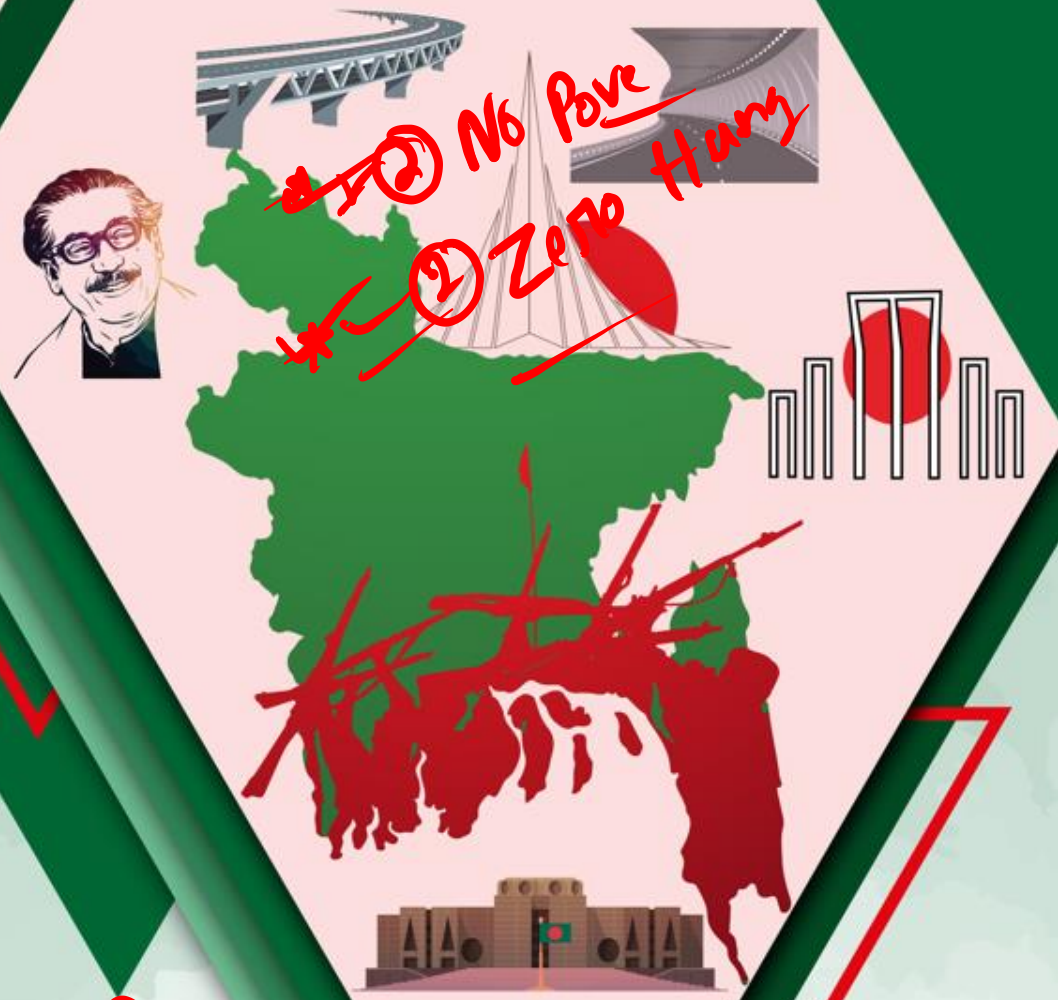

লেকচার: ১১

টপিক:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক-২: দারিদ্র্য বিমোচন, দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ, মেগা প্রজেক্ট, GNP, NNP, GDP, PPP, রেমিট্যান্স, মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অগ্রগতি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

জাতীয় আয়

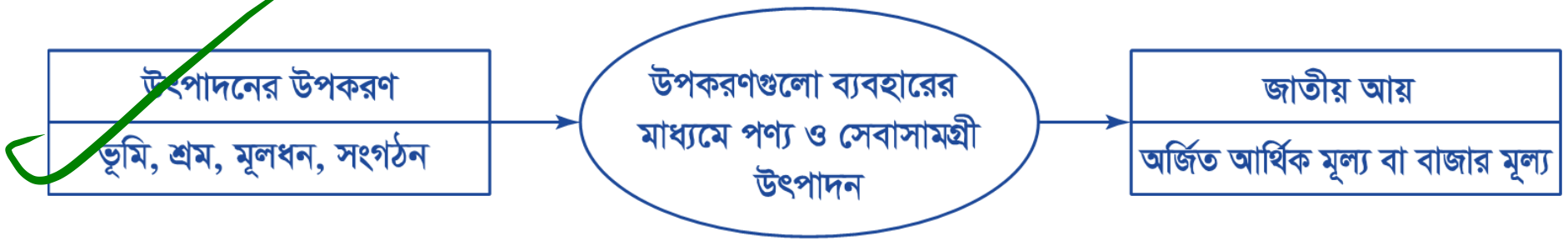

চিত্র : এক নজরে জাতীয় আয়

মাথাপিছু জাতীয় আয় (Per capita National Income)

একটি দেশের জনসাধারণের জনপ্রতি আয়কে মাথাপিছু জাতীয় আয় বলা হয়। মোট জাতীয় আয়কে জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় পাওয়া যায়। মোট জাতীয় আয় দেশের জনগণের প্রাপ্যতা নির্দেশ করে শুধু। এটি কখনো প্রতিটি মানুষের সমপরিমাণ আয় বুঝায় না। অর্থাৎ, মাথাপিছু জাতীয় আয় জাতীয় আয়ের বণ্টন নির্দেশ করে না।

$$\text{মাথাপিছু জাতীয় আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

GDP

GDP GNP নাকি?

GNP

জাতীয় আয়

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)/ Gross National Product

একটি দেশের সব নাগরিকদের ১ বছরের মোট ভোগ ব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয়, মোট সরকারি ব্যয় এবং নিট রপ্তানি আয়ের (মোট আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয়ের পার্থক্য) সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বলা হয়।

$$GNP= C+I+G+X_0+Z$$

যেখানে, C= ভোগ ব্যয়; I= বিনিয়োগ ব্যয়; G= সরকারি ব্যয়; X_0 = আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্য; Z= দেশের জনগণের অর্জিত আয় (দেশে ও বিদেশে)।

একটি দেশের রেমিট্যান্স, রপ্তানির নিট আয়, অনুদান, ইপিজেড থেকে প্রাপ্ত আয় GNP তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জাতীয় আয় (NI) ও GNP এর সম্পর্ক

NI = GNP – [DC + Ti + Tp + Sg - Gs] এক্ষেত্রে, DC = অবচয় ব্যয়, Ti = পরোক্ষ ব্যবসা কর, Tp = হস্তান্তর পাওনা, Sg = সরকারের চলতি উদ্বৃত্ত, Gs = সরকারি ভর্তুকি। সুতরাং GNP ও NI এক নয়। তবে অর্থনীতিবিদগণ স্বল্প সময়ে জাতীয় আয় নির্দেশ করার প্রয়োজনে অনেক সময় GNP কে ব্যবহার করেন।

জাতীয় আয়

নিট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product)

মোট জাতীয় উৎপাদন হতে মূলধনি দ্রব্যের ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় (Depreciation cost) বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা হল 'নিট জাতীয় উৎপাদন' (Net National Product-NNP)। মোট জাতীয় উৎপাদন একটি বৃহৎ ধারণা। অপর দিকে নিট জাতীয় উৎপাদনের অংশটি সংকীর্ণ। কারণ নিট জাতীয় উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদনের একটি অংশ মাত্র। সুতরাং,

নিট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন - মূলধনের অপচয়জনিত ব্যয়

নিট দেশজ উৎপাদন (NDP): একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক অর্থবছরে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে সমস্ত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাসমূহ উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্য হতে মূলধনি দ্রব্যের ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে 'নিট দেশজ উৎপাদন' (NDP) বলে। দেশজ উৎপাদন (GDP) হতে মূলধনি দ্রব্যের ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে নিট দেশজ উৎপাদন (NDP) পাওয়া যায়।

জাতীয় আয়

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)/Gross Domestic Product

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক অর্থবছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার সমষ্টিকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product-GDP) বলা হয়। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-

$$GDP = C + I + G + Nx$$

C = ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এর খরচ; I = বিনিয়োগ; G = সরকারের খরচ; Nx = মোট রপ্তানি

জাতীয় আয়

জিডিপি হিসাব

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জিডিপির হিসাব প্রাক্কলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত System of National Accounts (SNA) ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশ জিডিপি প্রাক্কলন করে। জাতীয় আয়ের ন্যায় জিডিপি নিরূপণে তিনটি পদ্ধতি: উৎপাদন (production approach), আয় (Income approach) এবং ব্যয় (Expenditure approach) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশ উৎপাদন ও ব্যয়ভিত্তিক জিডিপি প্রণয়ন করে।

আয় পদ্ধতি (Income Method)	ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method)	উৎপাদন পদ্ধতি (Production Method)
✓ শ্রমিকের মজুরি (w) ✓ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা (π) ✓ ভূমির কর থেকে সরকারের আয় (r) ✓ সুদ বাবদ আয় (i) ইত্যাদি হিসাবে ধরে নিয়ে জিডিপি হিসাব করা হয়। অর্থাৎ $GDP = \Sigma w + \Sigma \pi + \Sigma r + \Sigma i$	✓ ভোগ্যপণ্যে ব্যয় (C) ✓ বিনিয়োগ সম্পর্কিত খরচ (I) ✓ সরকারি খরচ (G) ✓ নিট রপ্তানি (Nx) প্রভৃতি ব্যয় ধরে নিয়ে জিডিপি হিসাব করা হয়। অর্থাৎ $GDP = C + I + G + Nx$	কৃষি, শিল্পোৎপাদন, সেবা প্রভৃতি খাতের মোট উৎপাদন দ্বারা জিডিপি হিসাব করা হয়।

মাথাপিছু জিডিপি (Per capita GDP)

দেশের জনসাধারণের জনপ্রতি GDP কে মাথাপিছু জিডিপি বলা হয়। মাথাপিছু জিডিপি দ্বারা একটি দেশের জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করা হয়। জিডিপির ন্যায় মাথাপিছু জিডিপিও স্থির মূল্যে এবং চলতি মূল্যে হিসাব করা হয়।

$$\text{মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{মোট GDP}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

মানবসম্পদ

মানবসম্পদ উন্নয়নের নির্ধারকসমূহ

- জীবন প্রত্যাশা/ গড় আয়ু
- মাথাপিছু আয়
- শিক্ষার হার
- সামাজিক নিরাপত্তা
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো
- দরিদ্রতা

মানবসম্পদ কী?

মানব সম্পদ উন্নয়নে সরকার গৃহীত পদক্ষেপ আলোচনা কর।

৪টি মন্ত্রণালয়

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

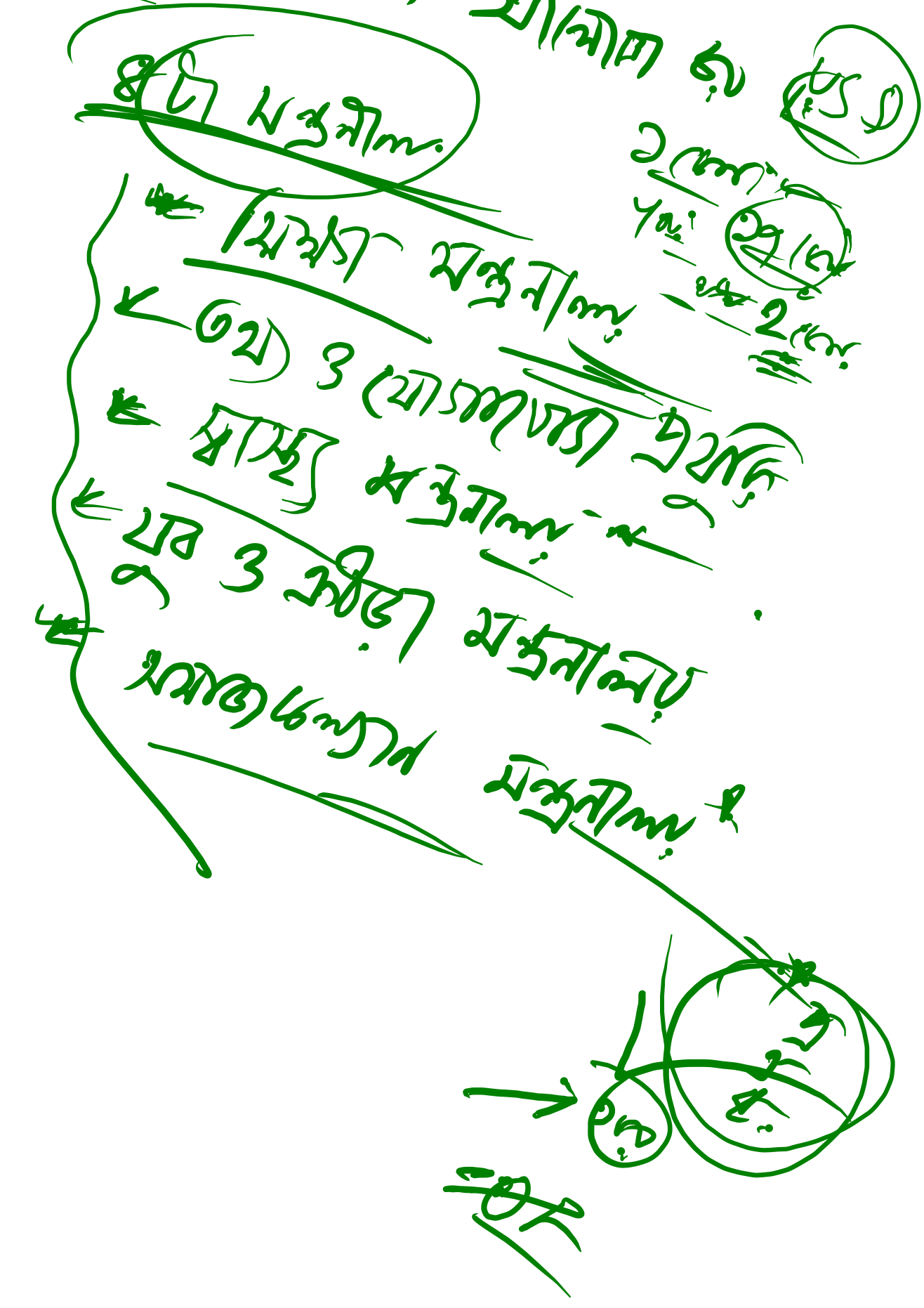

নারী শিক্ষার ও উন্নয়ন
স্বনির্ভর নীতি

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ

➢ **শিক্ষার উন্নয়ন:** শিক্ষার উন্নয়নে সরকার নিম্নের পদক্ষেপ নিয়েছে-

✓ জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০	✓ কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা	✓ নতুন বই বিতরণ
✓ স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	✓ আইসিটি এর ব্যাপক ব্যবহার	✓ উপবৃত্তি প্রদান
✓ ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা প্রদান।		

➢ **নারী ও শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম:** রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ ও বিধিমালা ২০১৮, শিশু একাডেমি আইন ২০১৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ

- **স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :** সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় সারাদেশে ১৪,১৪১টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রতিদিন ৬০০০-৮০০০ জনগণকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়াও সরকার করোনা মোকাবেলায় টিকা প্রদান কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি EPI ভুক্ত ১০টি টিকা প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যার ফলে শিশু মৃত্যু হার হাজারে-২১ জন ও মাতৃ মৃত্যুহার লাখে- ১৬৫ জনে নেমে এসেছে। জনগণের গড় আয়ু বেড়ে ৭২.৩ বছর হয়েছে।

- **প্রশিক্ষণ :** দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার নানান প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রেখেছে। এর মধ্যে নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি রয়েছে।

- **দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি :** দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, আশ্রয়ণ প্রকল্প, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

- **ডিজিটাল বাংলাদেশ :** ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সরকার ডিজিটাল মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রণোদনা প্রদান, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবসম্পদ গঠন ইত্যাদি।

মানবসম্পদ

যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন : যুবসমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা, কর্মোপযোগী কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যুবসমাজের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ, যুবঋণ প্রদান, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি কর্মসূচি চালু রয়েছে।

সমাজকল্যাণ কার্যক্রম : দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি, ক্যান্সার, কিডনি এবং লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ

- **করোনার টিকা প্রদান :** কোভিড-১৯ মহামারি হতে জন জীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) এর আওতায় পূর্বেই National Deployment and Vaccination Plan প্রণয়ন করা হয়েছিল। যার মাধ্যমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হয় এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্যোগে www.surokkha.gov.bd ওয়েব পোর্টাল এর মাধ্যমে বয়স ও প্রাধিকার ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়। সর্বশেষ সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২ পর্যন্ত ২ ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১২,১৪,২৫,৫৩৯ জন এবং ৩য় ডোজ টিকা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪,৪৪,৫১,৯৫৫ জন।

মানবসম্পদ উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দের গতিধারা

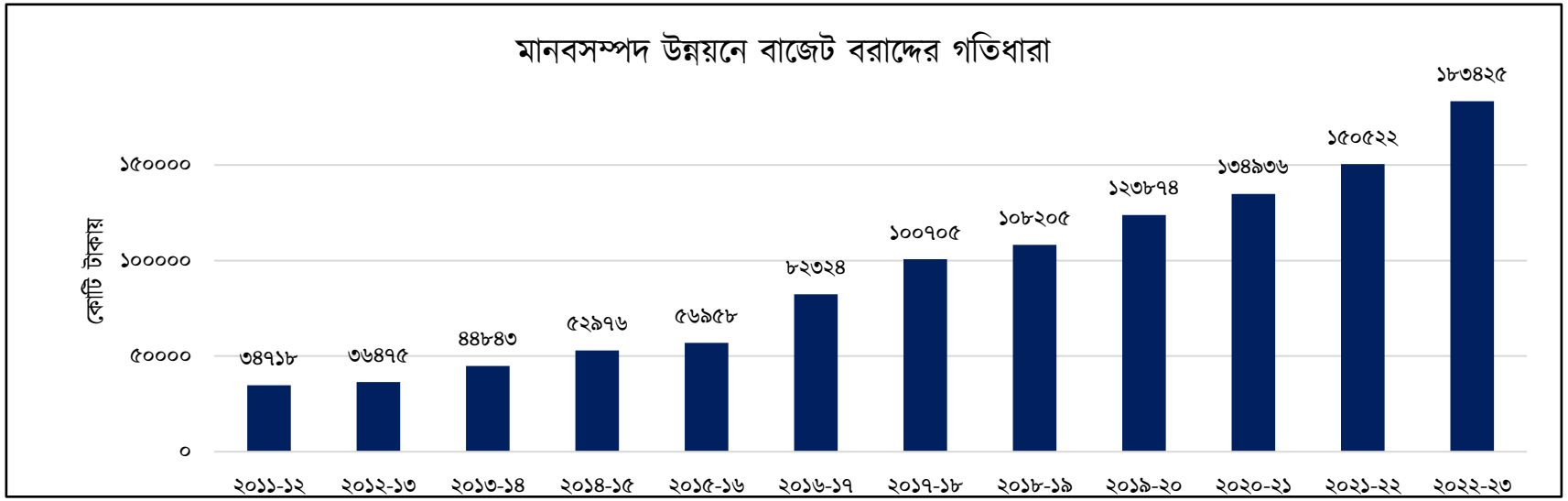

[তথ্যসূত্র : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়]

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

বাংলাদেশের প্রায় ১.২০ কোটি জনশক্তি পৃথিবীর প্রায় ১৭৪টি দেশে কর্মরত রয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশে ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এবং করোনার কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের ব্যাপক হারে প্রত্যাবর্তন সত্ত্বেও ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮,২০৫.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ২৪,৭৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ২১,০৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। নিচে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলো:

অর্থবছর	কর্মজীবী প্রেরণের সংখ্যা (হাজারে)	অর্থবছর	কর্মজীবী প্রেরণের সংখ্যা (হাজারে)
২০১৬-১৭	৯০৫	২০১৯-২০	৫৩১
২০১৭-১৮	৮৮০	২০২০-২১	২৮০
২০১৮-১৯	৬৯৩	২০২১-২২* (ফেব্রুয়ারি)	৫৭৬

[সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা – ২০২২]

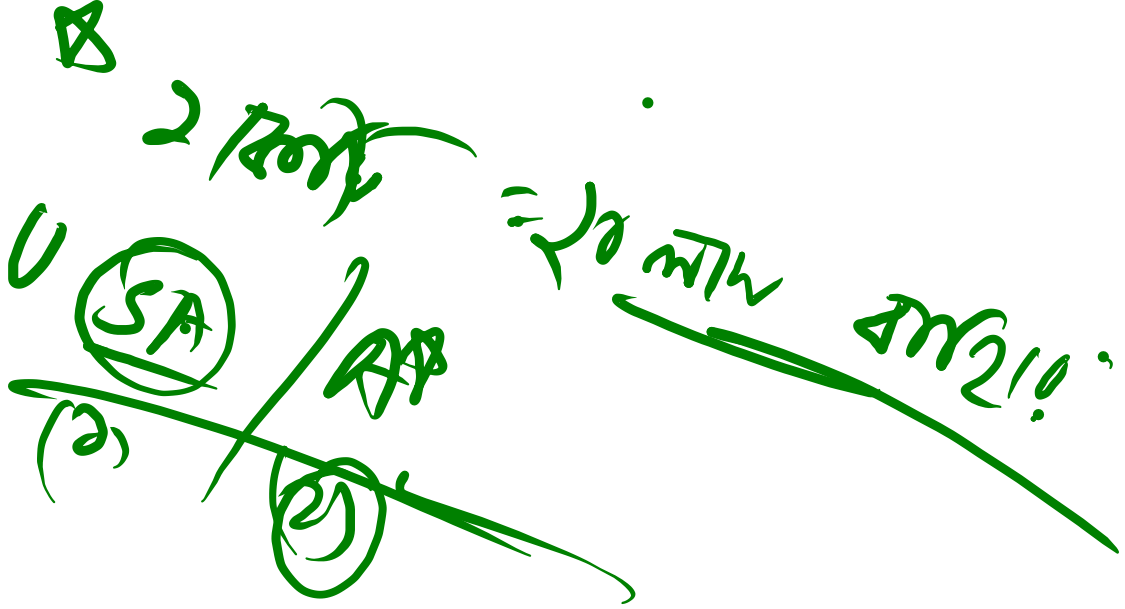

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

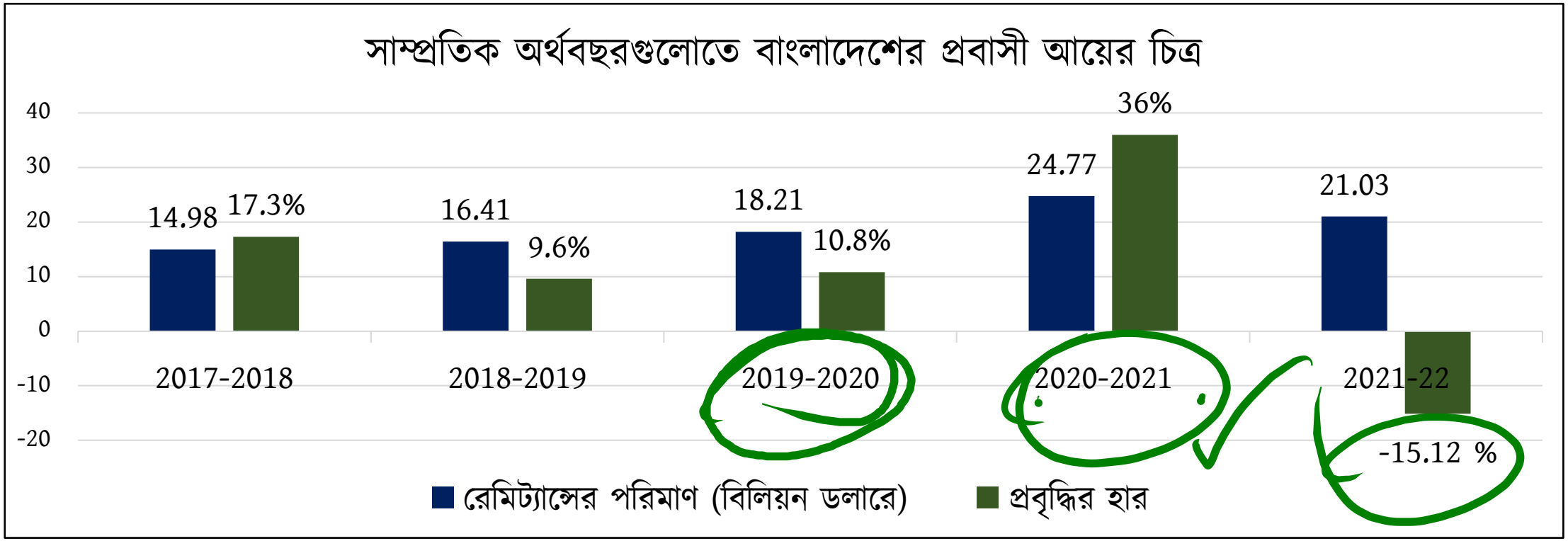

[তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক]

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি মূলত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক। প্রবাসী আয় সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশে আসে সৌদি আরব থেকে। ২০১৯ সালে মোট জনশক্তির ৫৭% ই সে দেশে যায়। নিম্নে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স প্রেরণের তথ্য উল্লেখ করা হলো :

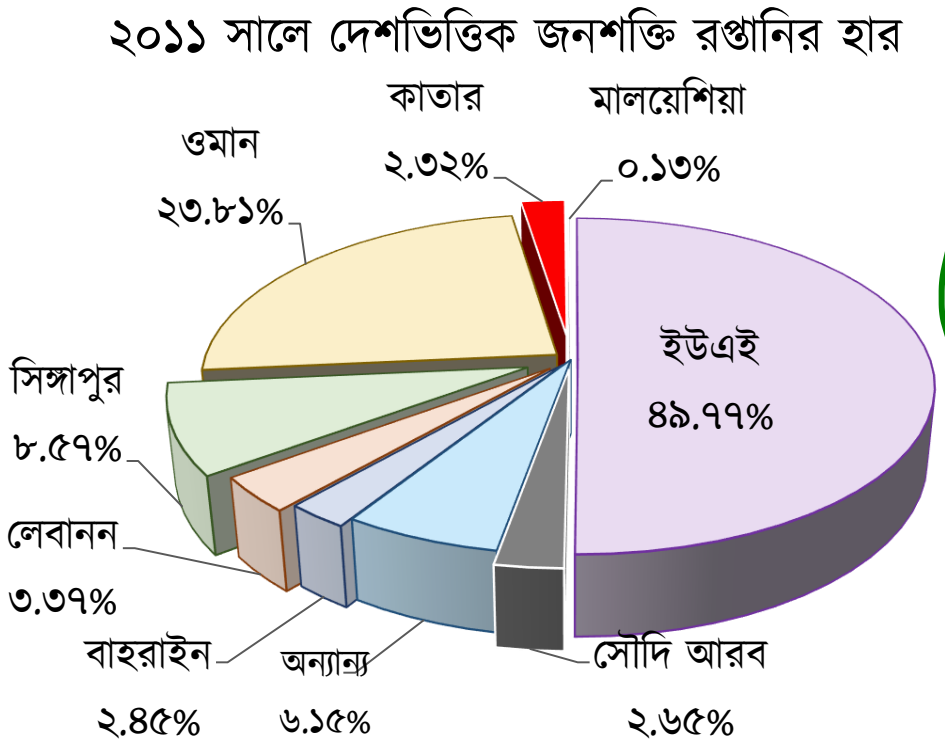

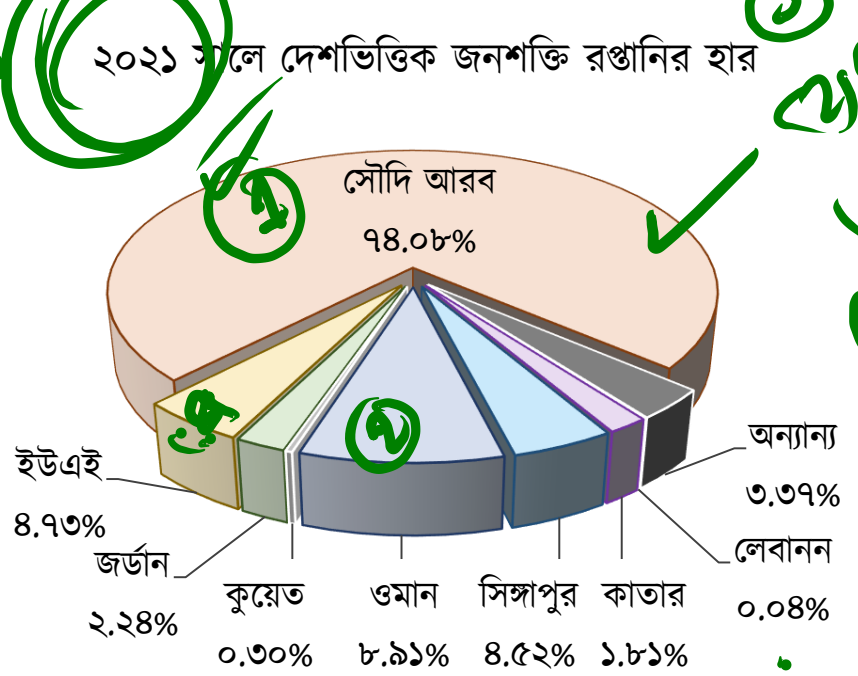

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান

- **বাণিজ্য ঘাটতি পূরণ:** বাংলাদেশ সাধারণত বাণিজ্য ঘাটতিতে থাকে। এর ঘাটতি অংশ প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। নিম্নে বাণিজ্য ঘাটতি ও রেমিট্যান্সের আকার দেওয়া হলো :

অর্থবছর	বাণিজ্য ঘাটতি	রেমিট্যান্স	অর্থবছর	বাণিজ্য ঘাটতি	রেমিট্যান্স
২০১৯-২০	১৮.৫ বিলিয়ন	১৮.২ বিলিয়ন	২০২০-২১	২৩.৭ বিলিয়ন	২৪.৮ বিলিয়ন

- **রিজার্ভ বৃদ্ধি:** করোনা মহামারিকালে ২০২১ সালের আগস্টে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ মজুদ করে। কিন্তু বর্তমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে রিজার্ভ কিছুটা কমে গিয়েছে।

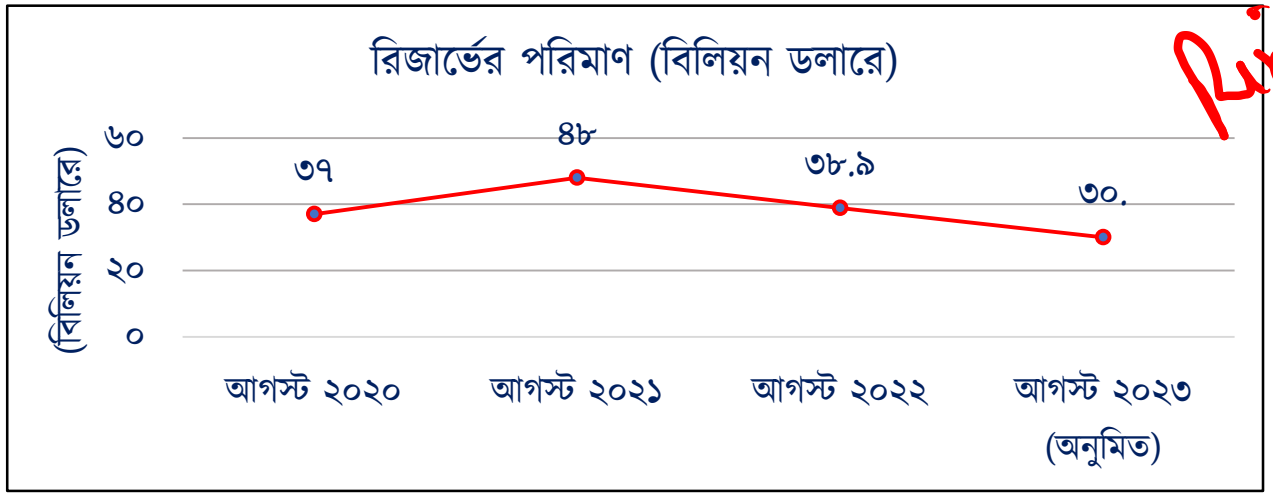

(๑) ขนม ยำใจ ลงเม

(๒) โคลง สุ่ม

(๓) เสมะหาน ระบุ เอกาพ่

(๔) นที: ธุ์ สมบูร

(๕) อนุเคราะห์ ใจบุญ

(๖) ตรัสดา, เบ็ดเตล็ด

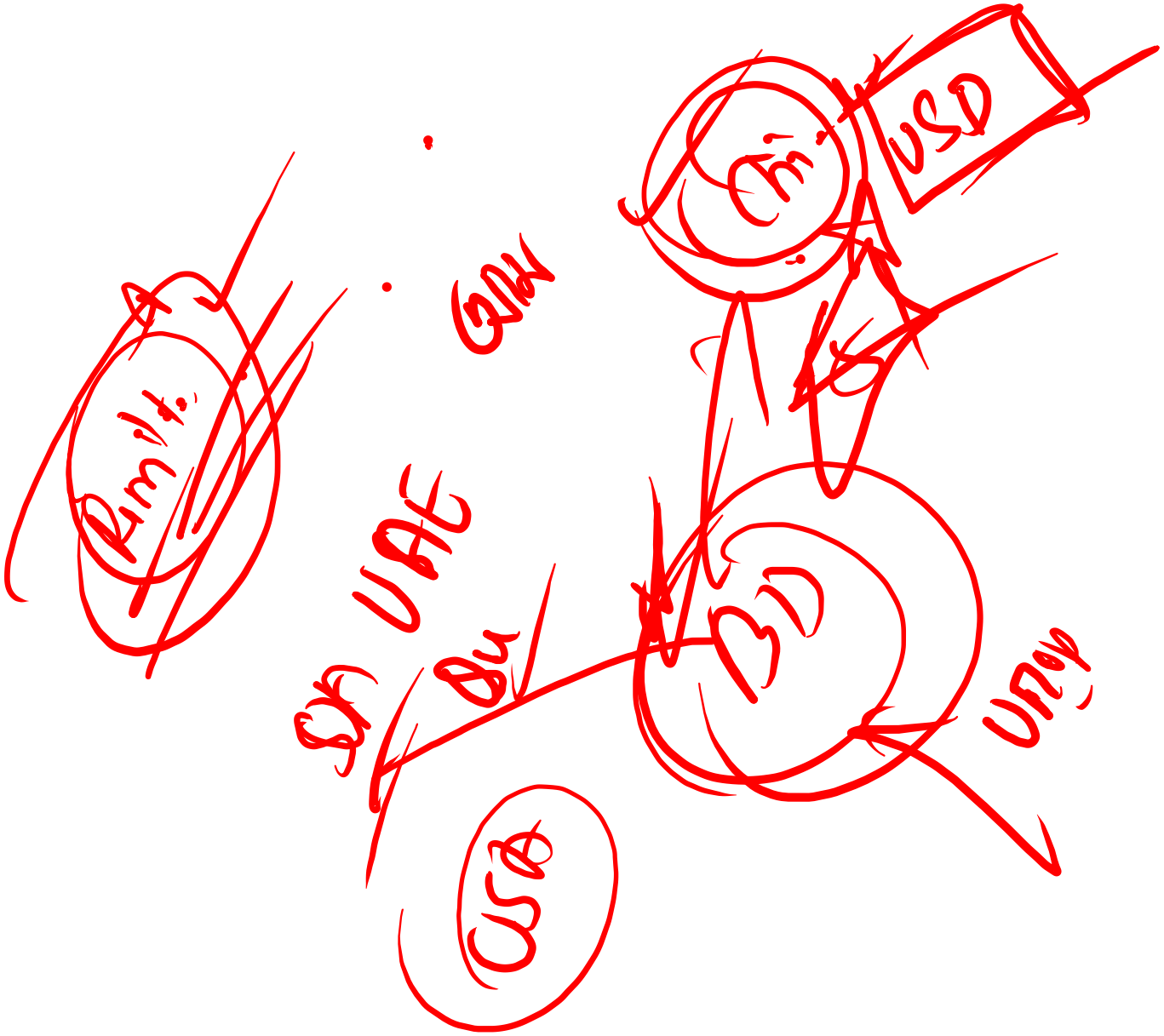

USD
BD
UAE
USD

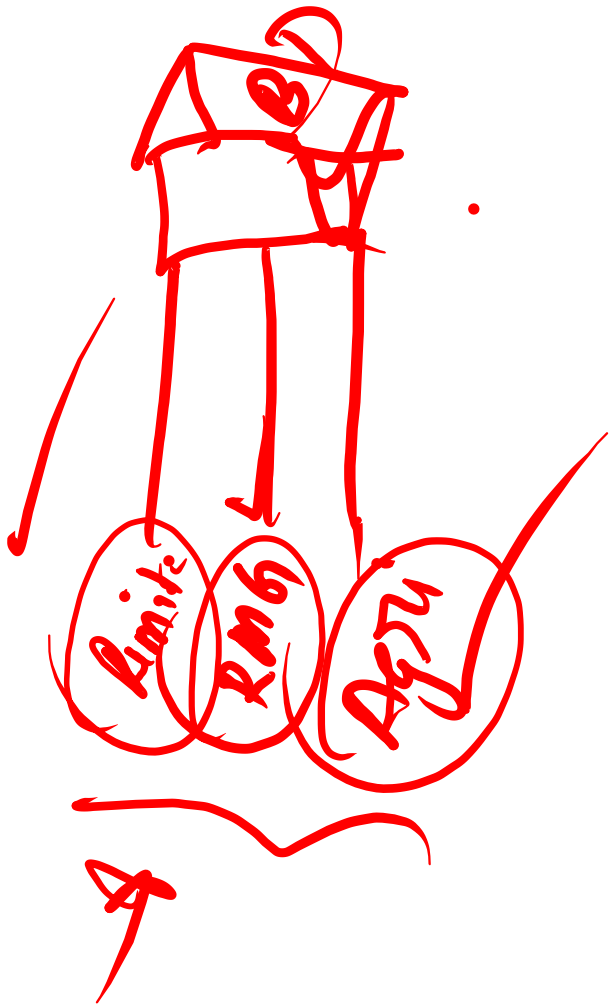

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

- **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি:** দেশের প্রায় ১.২০ কোটি জনগণ প্রবাসে কর্মরত রয়েছে। এতে বেকারত্বের সমস্যা লাঘব হচ্ছে।
- **নারীর ক্ষমতায়ন:** বর্তমানে ৯ লাখের বেশি নারী প্রবাসে কর্মরত রয়েছে। এতে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে।
- **অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিনিয়োগ:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রতিবছর রেমিট্যান্সের ২৫% বিনিয়োগ করা হয়, এর মধ্যে সিংহভাগই প্রবাসীদের বাড়িঘর নির্মাণে।
- **জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি:** এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের ৭৮ শতাংশই ব্যয় হয় সংসারের ব্যয় নির্বাহের জন্য।

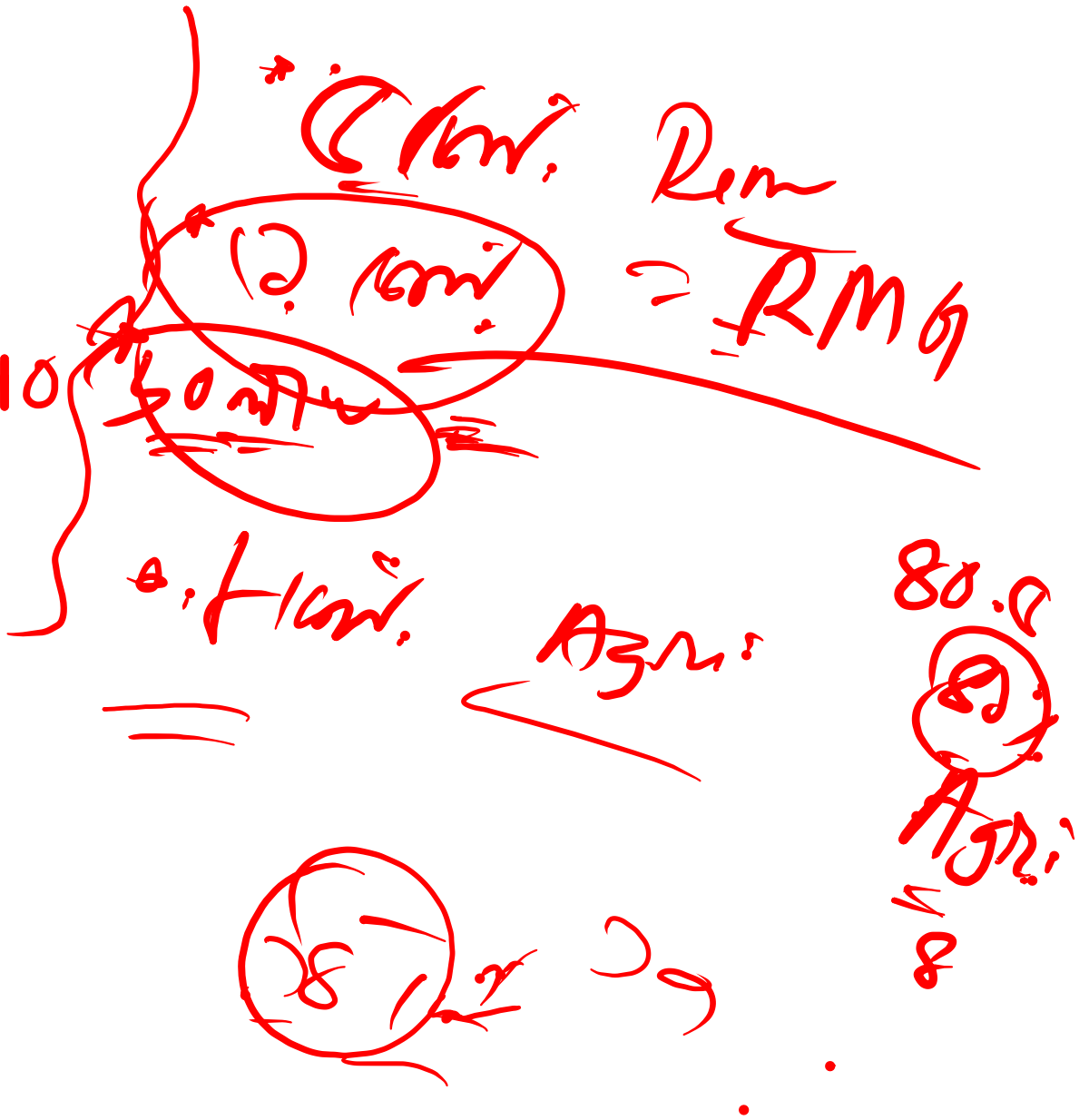

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে সরকারের পদক্ষেপ

বৈধ উপায়ে বিভিন্ন ধরনের রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান: কোভিড-১৯ সময়কালে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানো সহজীকরণ ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সহায়ক নীতিমালা প্রবাসীদেরকে অধিক রেমিট্যান্স প্রেরণে সহায়তা করেছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমজীবী মানুষের কষ্টার্জিত বৈদেশিক আয় ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে দেশে প্রত্যাবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণের বিপরীতে সরকার কর্তৃক ২ শতাংশ প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদানের বিদ্যমান হার বাড়িয়ে ২.৫০ শতাংশ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রমবাজার সম্প্রসারণ : করোনাভাইরাস মহামারিতে বিশ্বজুড়ে লকডাউন এবং অচলাবস্থার কারণে বহুমাত্রিক সংকট দেখা দিয়েছে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি খাতে। প্রবাসীদের সামগ্রিক কল্যাণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি এবং ওই বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সরকার কাজ করছে। বিশ্বের ১৭০টি দেশে বাংলাদেশি কর্মী ছাড়পত্র নিয়ে গমন করছেন। মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। বর্তমানে ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে শ্রমিক প্রেরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশে কর্মী প্রেরণের চাহিদা নিরূপণের জন্য ৫৩টি সম্ভাব্য দেশে শ্রমবাজার গবেষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও গ্রিস এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন করে জাপানে ১৪টি খাতে ৩.৫ লাখ লোক নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও শ্রমবাজার গবেষণার মাধ্যমে ৬৩টি নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

অভিবাসন ব্যয় হ্রাস : বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ অভিবাসন ব্যয়। সরকার এ ব্যয় ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে সরকার শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন নিয়োগকারী সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং জর্ডানে বিনা ব্যয়ে অথবা সর্বনিম্ন অভিবাসন ব্যয়ে কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, হংকং, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। নারী কর্মীদের বাধ্যতামূলক ১ মাসের প্রশিক্ষণ শেষে বিদেশে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১ সালে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত নারী কর্মীর সংখ্যা ৮০, ১৪৩ জন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন: সরকার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১ সালে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি হতে ৫,৯৮,৯৭৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে পুরুষ ও মহিলা অভিবাসী কর্মীদের জন্য দেশ ভিত্তিক প্রাক-প্রস্থান প্রশিক্ষণ। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানের এ সকল প্রশিক্ষক দ্বারা City and Guilds Curriculum এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। সৌদি আরব ও হংকং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে নারী কর্মীরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সরাসরি বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে।

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন: রিক্রুটিং এজেন্সি এবং দালালদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ হ্রাস করতে ফিঙ্গার প্রিন্টসহ অভিবাসী কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেইজড নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ডাটাবেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ড দিয়ে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হচ্ছে। বিমানবন্দরে বিদেশগামী কর্মীদের বিড়ম্বনা ও প্রতারণা বন্ধকরণের জন্য তাদের তথ্য স্মার্টকার্ডে লিপিবদ্ধ করে পুনরুদ্ধার করা হয়।

অভিবাসনখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন: অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' এবং 'প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। নিয়োগকারী সংস্থাগুলো অভিবাসন খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাদের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য সরকার 'বিদেশি কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (নিয়োগকারী এজেন্ট লাইসেন্স এবং আচরণ) বিধিমালা ২০১৯' এবং 'বিদেশি কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) নীতিমালা ২০২০' প্রবর্তন করেছে। অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বাধ্যতামূলক বিমা প্রকল্প ২০১৯ সাল থেকে গৃহীত হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

➢ **চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ:** অভিবাসী কর্মীদের বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে, কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন অভিবাসী শ্রমিকদের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আবার, এই মহামারি চলাকালীন অনুকূল পরিস্থিতিতে তাদের কর্ম ক্ষেত্রে পাঠানোর জন্য বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদেশে গমনেচ্ছু অভিবাসী কর্মীদের দ্রুত কোভিড-১৯ টিকা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য ৭০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন ঋণ পুরুষ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ সুদে এবং মহিলা ঋণ ৭ শতাংশ সুদে প্রদান করা হচ্ছে। বিদেশে অবস্থানরত অভিবাসী কর্মীদের পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, সন্তানদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু অভিবাসী বৃহৎ পরিবার ঋণ পুরুষ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ সুদে এবং মহিলা ঋণ ৭ শতাংশ সুদে প্রদান করা হচ্ছে।

➢ **G2G পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ:** জর্ডানে বিনা খরচে গৃহকর্মী প্রেরণ ও গার্মেন্টস খাতে ন্যূনতম ব্যয়ে নারীকর্মী প্রেরণ করা হয়। এছাড়া বিমানভাড়াসহ ৬৮০০০ টাকায় কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ।

রেমিট্যান্স/প্রবাসী আয়

- **শ্রমবাজার গবেষণা সেল:** শ্রমবাজার ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রমবাজার গবেষণা সেল গঠন করা হয়। যার মাধ্যমে নতুন নতুন শ্রমবাজার খুঁজে বের করা হয়।

- **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক:** বিদেশ গমনেচ্ছুদের সহায়তা দিতে ও ফিরে আসা কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানে আর্থিক সহায়তা দিতে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। এ ব্যাংকের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে প্রবাসীদের সহায়তা করা হয়ে থাকে।

- **US Doller Investment Bond:** প্রবাসীদের জন্য ৩ বছর মেয়াদি এ বন্ড চালু করে সরকার। যার মেয়াদ শেষে ৬.৫% হারে মুনাফা দেওয়া হবে।

দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি

একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসাবে দারিদ্র্য বিমোচন অন্যতম। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর দেশের দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৮৯ শতাংশ। পরবর্তীতে নানান পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। সেসব পরিকল্পনা ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ, অন্তর্বর্তীকালীন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র গ্রহণ, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ইত্যাদি। এছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০০ সালে গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (Millennium Development Goals-MDGs) এর প্রথম লক্ষ্য ছিল চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষুধামুক্তি। এসব কর্মসূচি ও পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ২০২২ সালে দারিদ্র্যের হার ২০.৫ শতাংশে এসে পৌঁছেছে এবং এপ্রিল ২০২৩ অনুযায়ী ১৮.৭ শতাংশ। নিম্নে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার দেখানো হলো:

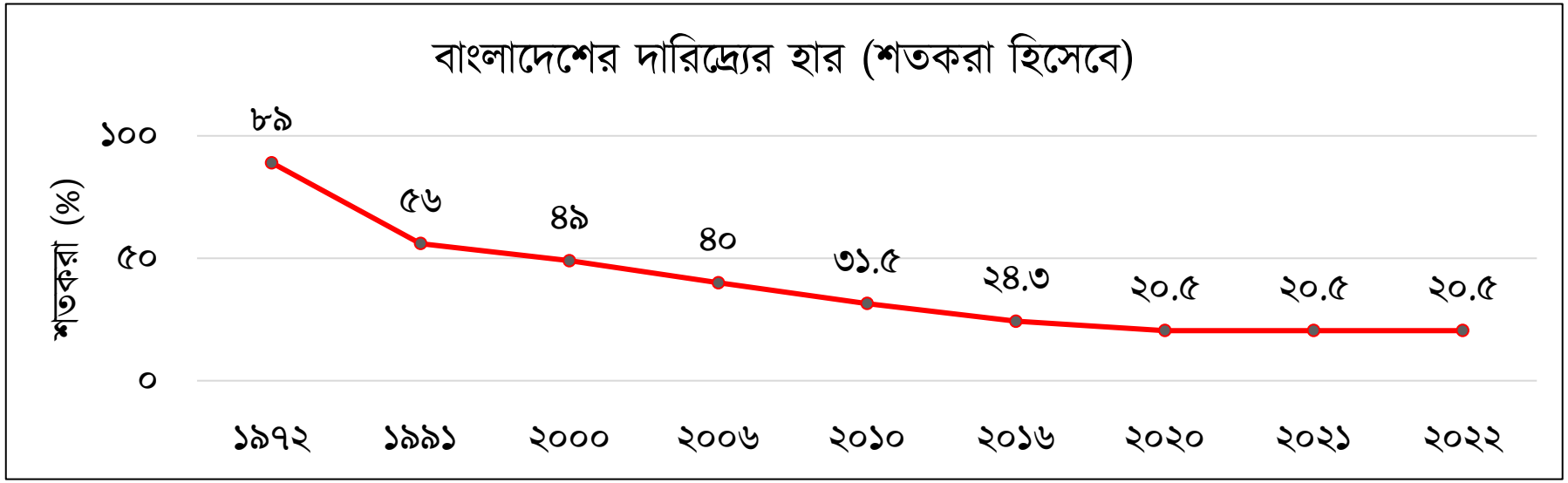

[তথ্যসূত্র: সমীক্ষা-২০২২ ও বিবিএস।]

✓ শ্রমবাজার: তৈরী।
✓ শ্রমবাজার: চাকরি তো।
✓ ৩ ২৫ দক্ষতা মান
✓ ডিজিটালাইজেশন
✓ প্রবাসন ও
✓ অভিবাসন ৩য় ২য়

তারিখ ৪ঠা/ম.জ. ২য়/ তারিখ: ২৫ক

(ক) জন্ম ? : ১২২ খ্রি. পূর্বাব্দ.

(খ) মৃত্যু ? : ৬৮ খ্রি পূর্বাব্দ.

(গ) জন্ম বিষয়ে গবেষণা:
[illegible]

দারিদ্র বিমোচন

দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

- **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন:** ১৯৭৩-৭৮ মেয়াদে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উৎপাদন ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়ন, বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। পরবর্তীতে সরকার মোট আটটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সর্বশেষ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশে ও অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নামিয়ে আনার ঘোষণা দেওয়া হয়। যে পরিকল্পনার অধীন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ১ কোটি ১৩ লাখ।

- **পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF):** ১৯৯০ সালে সরকার কর্তৃক গঠন করা হয়। ADB বরাদ্দ ও রাজস্ব বাজেটের মঞ্জুরির মাধ্যমে এর তহবিল গঠন করা হয় যা গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে। শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত PKSF এর ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ১.৫৭ কোটি সদস্যদের মধ্যে প্রায় ৪৪,৩১২ কোটি টাকা আর্থিক পরিষেবা প্রদান করা হয় এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে বিভিন্ন খাতে PKSF এর আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ প্রায় ৪,৮৩২ কোটি টাকা।

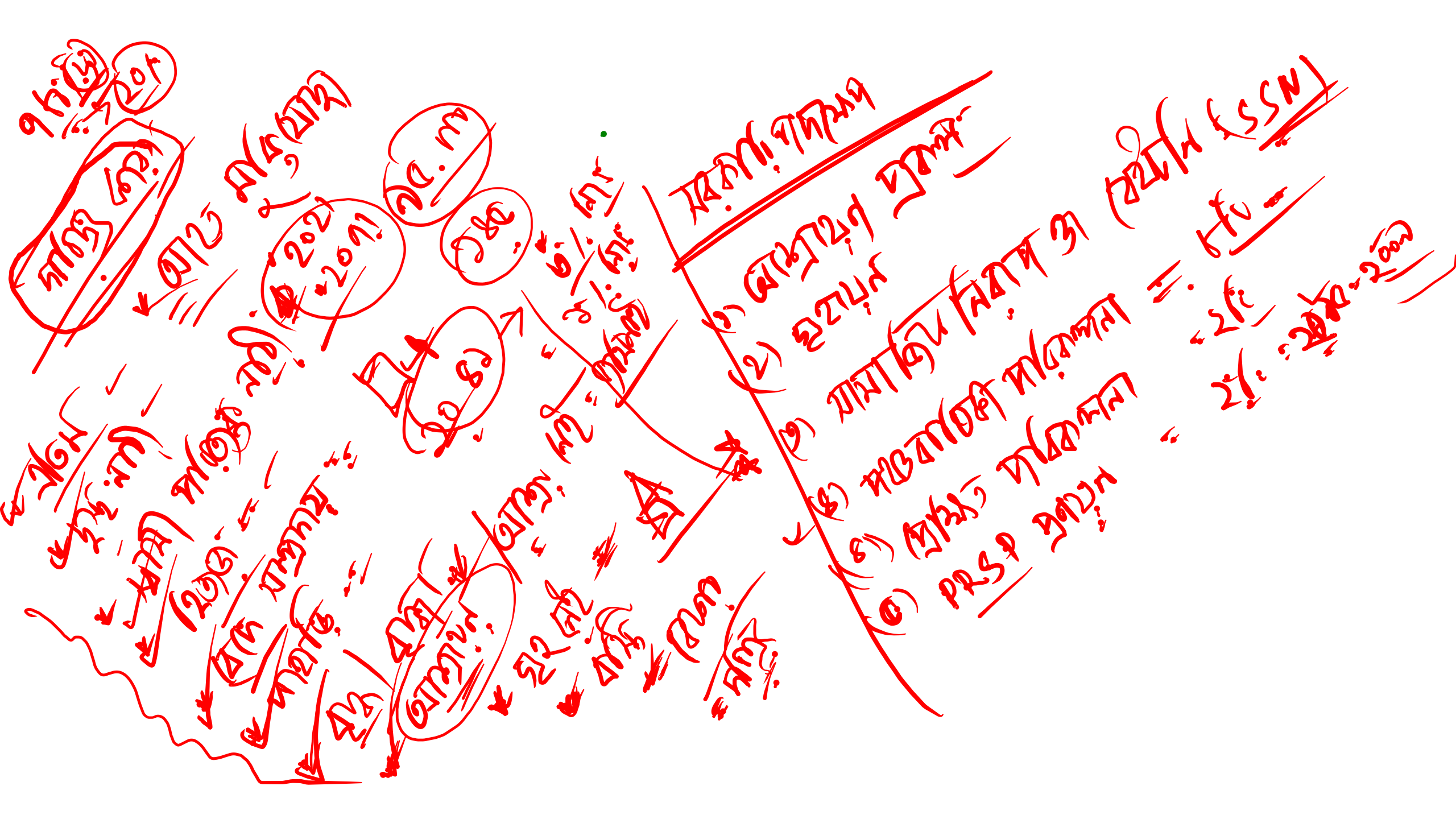

প্র। ২৫।

অর্থায়নঃ
প্রকল্পঃ
সমাজসেবা লি. ৫
পল্লী কর্মসংস্থান
পরিবার
PKSF
আমার বাড়ি আমার খামার

৩.৫ লাখ
২ লাখ
১০.৫ লাখ
১৫ লাখ

কাবিখাঃ
কাবিটাঃ
VGD
VGF
PKSF
PDBF

PKSF : R+R
PDBF

৫

PKSF

২

৩

৪

প্রশিক্ষণ > Teacher + ছাত্র

BARD *

RDA "

ATMG "

দারিদ্র বিমোচন

- **কৃষি উন্নয়ন:** দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকার কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সার ও সার তৈরির কাঁচামালের উপর আমদানি কর ও ভ্যাট প্রত্যাহার করেছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কৃষিতে বরাদ্দ ছিল বাজেটের ৬.২%। করোনা মহামারি চলাকালে সরকার কৃষকের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করে। এছাড়াও কৃষিতে বরাদ্দ ও ভর্তুকির তথ্য নিম্নরূপ:

অর্থবছর	কৃষিতে বরাদ্দ	ভর্তুকি	অর্থবছর	কৃষিতে বরাদ্দ	ভর্তুকি
২০২০-২১	২৯৯৮১ কোটি টাকা	৯৫০০ কোটি টাকা	২০২১-২২	৩১৯১২ কোটি টাকা	৯৫০০ কোটি টাকা
২০২২-২৩	৩৩৬৯৮ কোটি টাকা	১৬০০০ কোটি টাকা			

- **সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (CVDP):** দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১০০৩৫টি সমিতির গঠন করে ৩.৫ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে।

- **আশ্রয়ণ প্রকল্প:** আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে মোট ৮,৮৫,০০০ গৃহহীন পরিবারকে ঘর প্রদান করা হয়। যার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ (১৯৯৭-২০০২), এবং আশ্রয়ণ-২ (২০১০-২০২৪) প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪৪২৬০৮টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

দারিদ্র বিমোচন

- **কর্মসংস্থান ব্যাংক:** এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। ৬৪ জেলায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ২৯,১৬,০১৩ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৩২৮.৪৩ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

- **একটি বাড়ি একটি খামার:** সারাদেশে ১.২০ লাখ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে ৫৪.৬ লাখ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে ২ বছরের সঞ্চয় সমিতির নামে ব্যাংক একাউন্টে জমা এবং ২ বছরে ১.৫০ লাখ টাকা জমা হলে গ্রাহকের টাকার সমপরিমাণ অর্থাৎ ১.৫০ লাখ প্রকল্পের তহবিল হতে গ্রাহককে ৩ লাখ টাকা প্রদান।

- **পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন:** সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২০০৯ সালে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ২০২১-২২ অর্থবছরে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের সুযোগভোগী সদস্যদের ১৭,২৪৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

- **পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক:** এ প্রকল্পকে বাস্তবায়ন ও এর কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে সরকার ২০১৪ সালে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। যার অনুমোদিত মূলধন এখন ১০০০ কোটি টাকা।

- **সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:** ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অধীনে মোট ১২০টিরও বেশি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ৭৩টিরও বেশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অংশ।

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)

Poverty Reduction Strategy Papers এর বাংলা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিশ্বে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণভাবে গৃহীত নীতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সহযোগিতার জন্য প্রণীত দলিল বা রূপরেখা। দেশগুলো তাদের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে কৌশলসমূহ প্রস্তুত করে। এ দলিল প্রণয়নের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য (এমডিজি) এবং দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে MDGs এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য এ কৌশলপত্র গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বব্যাংক এর উদ্যোগে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP-1) পরিকল্পনার সূচনা ঘটে ২০০২ সালে, যা চূড়ান্ত হয় ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে।

দারিদ্র বিমোচন

দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র-২

২০১৫ সালের মধ্যে GDP প্রবৃদ্ধি ৮% করা এবং দারিদ্র্যের হার ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় ২৯ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে সংশোধিত দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (PRSP-2) অনুমোদিত হয়। PRSP-2 বাস্তবায়ন ২১টি খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষায়। বিশেষ খাত হিসেবে বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়। তবে, এর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ৮টি -

১. কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২. পুষ্টি	৩. মাতৃস্বাস্থ্য	৪. পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা
৫. কারিগরি জ্ঞান	৬. সুশাসন	৭. দুর্নীতি দমন	৮. তদারক করা।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বা বেষ্টনী

সরকারের গৃহীত কর্মসূচি

দেশে বর্তমানে ১২৩টিরও বেশি Social Safety Net প্রকল্প চলমান আছে যার মধ্যে ৭৩টিরও বেশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অংশ। যার মধ্যে রয়েছে –

আর্থিক সাহায্য

✓ **বয়স্ক ভাতা:** এ ভাতা চালু হয় ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে। বর্তমানে ভাতার পরিমান ৫০০ টাকা।

অর্থবছর	মোট ব্যয়	আওতাভুক্ত
২০২০-২১	২৯৪০ কোটি টাকা	৪৯ লাখ মানুষ
২০২১-২২	৩৪৪৪ কোটি টাকা	৫৭ লাখ মানুষ
২০২২-২৩	৩৪৪৪.৫৪ কোটি টাকা	৫৭.০১ লাখ মানুষ

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বা বেষ্টনী

✓ **বিধবা ভাতা:** এ ভাতা চালু হয় ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে। বর্তমানে ভাতার পরিমান ৫০০ টাকা।

অর্থবছর	মোট ব্যয়	আওতাভুক্ত
২০২০-২১	১২৩০ কোটি টাকা	২০.৫ লাখ মানুষ
২০২১-২২	১৪৯৫ কোটি টাকা	২৪.৭৫ লাখ মানুষ
২০২২-২৩	১৪৯৫ কোটি টাকা	২৫.৭৫ লাখ মানুষ

✓ **প্রতিবন্ধী ভাতা:** এ ভাতা চালু হয় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত এ ভাতার পরিমাণ ৭০০ টাকা ছিল। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ ভাতার পরিমাণ ৭৫০ টাকা হয়।

অর্থবছর	মোট ব্যয়	আওতাভুক্ত
২০২০-২১	১৬২০ কোটি টাকা	১৮ লাখ মানুষ
২০২১-২২	১৮২০ কোটি টাকা	২০.০৮ লাখ মানুষ
২০২২-২৩	২৪২৯ কোটি টাকা	২৩.৬৫ লাখ মানুষ

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বা বেষ্টনী

✓ **মুক্তিযোদ্ধা ভাতা:** এ ভাতা চালু হয় ১৯৯৬ সালে। যার আওতাভুক্ত ২ লাখ মানুষ।

অর্থবছর	ভাতার পরিমান	মোট ব্যয়	আওতাভুক্ত
২০২০-২১	১২০০০	২৮৮০ কোটি টাকা	২ লাখ
২০২১-২২	২০০০০	৪৬৫৩ কোটি টাকা	২ লাখ
২০২২-২৩	২০০০০	৪৬৫৩ কোটি টাকা	২ লাখ

✓ **মাতৃত্বকালীন ভাতা:** এ ভাতা চালু হয় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে। বর্তমানে ভাতার পরিমাণ ৮০০ টাকা।

অর্থবছর	মোট ব্যয়	আওতাভুক্ত
২০২০-২১	৭৫৩ কোটি টাকা	৭.৭ লাখ
২০২১-২২	৭৬৪ কোটি টাকা	

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বা বেষ্টনী

✓ **ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা:** এ ভাতা চালু হয় ২০১০-১১ অর্থবছরে। বর্তমানে এর পরিমাণ মাসিক ৫০০ টাকা।

অর্থবছর	মোট ব্যয়	আওতাভুক্ত
২০২০-২১	২৭০ কোটি টাকা	৭.৫৮ লাখ মানুষ
২০২১-২২	২৭৬ কোটি টাকা	

✓ **প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি:** বর্তমানে উপবৃত্তির পরিমান প্রাথমিক স্তরে ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা। উচ্চতর স্তরে মাসিক ১৩০০ টাকা

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ	আওতাভুক্ত
২০২০-২১	৯৫.৬৪ কোটি টাকা	১ লাখ শিক্ষার্থী
২০২১-২২	৯৫.৬৪ কোটি টাকা	
২০২২-২৩	৯৫.৬৪ কোটি টাকা	

✓ **হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন:** প্রায় ৪৭৮৫ হিজড়াকে জীবনমান উন্নয়নে মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হয়।

✓ **আশ্রয়ণ-২ ও ৩ প্রকল্প:** ২০২০-২১ অর্থবছরে খরচ ১৪৯৯ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ প্রায় ৬৪৫ কোটি টাকা। উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৮৩ হাজার পরিবার।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বা বেষ্টনী

খাদ্য সাহায্য

- ✓ কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা): চলতি অর্থবছরে বরাদ্দ করা হয় ৩.৫ লাখ মানুষের জন্য প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা।
- ✓ কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা): চলতি অর্থবছরে ২ লাখ মানুষের জন্য প্রায় ৮০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- ✓ VGD (Vulnerable Group Development): চলতি অর্থবছরে ১০.৪ লাখ মানুষের জন্য প্রায় ১৮৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- ✓ VGF (Vulnerable Group Feeding): চলতি অর্থবছরে ২ কোটি মানুষের জন্য প্রায় ১৪৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- ✓ জি আর (খাদ্য): চলতি অর্থবছরে ৩২ লাখ মানুষের জন্য প্রায় ৫৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ।
- ✓ OMS: চলতি অর্থবছরে ২৩ লাখ মানুষের জন্য প্রায় ১০১৯ কোটি টাকা।
- ✓ করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সুদ বাবদ ভর্তুকি: চলতি অর্থবছরে প্রায় ২৮০০ কোটি টাকা।

তথ্যসূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

মেগা প্রকল্প

মেট্রোরেল (এমআরটি লাইন – ৬)

অনুমোদন	একনেক সভায় ১৮ ডিসেম্বর, ২০১২		
নির্মাণ কাজ শুরু	২৬ জুন, ২০১৬		
উদ্বোধন	২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ (উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত)		
অবস্থান	উত্তরা থেকে কমলাপুর		
সম্ভাব্য ব্যয়	৩৩,৪৭২ কোটি টাকা; বৈদেশিক ঋণ ১৭,৯৪৪ কোটি টাকা (জাইকা), বাকিটা বাংলাদেশ সরকার		
মালিকানা	ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড		
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	৮ টি প্যাকেজের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে- প্যাকেজ-০১: টোকিও কন্সট্রাকশন কোম্পানি, জাপান প্যাকেজ-০২, ০৩, ০৪: ইতাল-থাই ডেভেলপমেন্ট, থাইল্যান্ড ও সিনোহাইড্রো, চীন প্যাকেজ-০৫: টেক্কেন করপোরেশন; আবদুল মোনেম লিমিটেড; আবে নিক্কো কোগিও কোম্পানি লিমিটেড প্যাকেজ-০৬: সুমিতোমা মিতসুই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, জাপান এবং ইতালিয়ান-থাই ডেভেলপমেন্ট, থাইল্যান্ড প্যাকেজ-০৭: মারুবিনি করপোরেশন, জাপান এবং এল অ্যান্ড টি, ভারত প্যাকেজ-০৮: কাওয়া সাকি- মিতসুবিশি কনসোর্টিয়াম, জাপান		
ধরন	উড়াল	স্টেশন সংখ্যা	১৬ টি (কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত হলে ১৭টি)
দৈর্ঘ্য	২০.১০ কিলোমিটার (কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত হলে ২১.২৬ কিলোমিটার)	সক্ষমতা	ঘণ্টায় ৬০ হাজার এবং দিনে ৫ লাখ যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে

পদ্মা সেতু: ১ম

(১) পদ্মা সেতু রেল প্রকল্প

(২) মেট্রোরেল: - প্রথম - সুরঙ্গ ৩ MRT 6

(৩) এক্সপ্রেসওয়ে

(৪) রামপাল কেন্দ্র

(৫) রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র

(৬) পায়রা:

(৭) মাতারবাড়ি কেন্দ্র

(৮) পায়রা সমুদ্র বন্দর

(৯) মহেশখালী গভীর সমুদ্র বন্দর

(১০) LNG

(১১) কর্ণফুলী টানেল প্রকল্প

২০মার্চ থেকে:

৪:২০ Resume

মেগা প্রকল্প

আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

- **যানজটের অর্থ অপচয় রোধ নিরসন:** ২০১৮ সালের বুয়েট পরিচালিত এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ঢাকা শহরের যানজটের জন্য ৪.৪ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়। যা বাজেটের প্রায় ১০ শতাংশ। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই খরচ বহুলাংশে হ্রাস পাবে।
- **যানজটের সময় অপচয় রোধ:** উত্তরা থেকে মতিঝিল প্রায় ২০ কিলোমিটার রাস্তায় চলাচলের জন্য সময় লাগে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা। বিশ্বব্যাংকের ২০১৭ এর প্রতিবেদন আনুযায়ী ঢাকার যানজটের কারণে প্রতিদিন ৩ মিলিয়ন কর্মঘণ্টা নষ্ট হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সময় কমে দাঁড়াবে ৪০ মিনিটে, যা অপচয় হওয়া কর্মঘণ্টা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাবে।
- **সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি:** এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকার দুই প্রান্তের যোগাযোগ উন্নয়ন হবে, যা সড়ক পথের উপর চাপ কমাবে। ফলস্বরূপ ঢাকার অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহণ সহজ হবে এবং পাশাপাশি অর্থ সাশ্রয় হবে। প্রকল্প বিশ্লেষণ তথ্য অনুযায়ী এই প্রকল্প দেশের জিডিপি ১ শতাংশ বৃদ্ধি করবে।

মেগা প্রকল্প

আবাসন সমস্যার সমাধান: মেট্রোরেল চালু হলে ঢাকা শহর থেকে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমানো যাবে। মানুষ অনেক কম খরচে বাসা ভাড়া করে শহরের বাইরে থাকতে পারবে এবং অফিস ও অন্যান্য কাজে সহজে ঢাকায় আসতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, গাজীপুর বা নারায়ণগঞ্জ এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা সমস্ত রুট সম্পূর্ণ হয়ে গেলে এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে মূল শহরে যেতে পারবে।

পরিবেশ দূষণহ্রাস: ঢাকার রাস্তায় চলমান সব যানবাহন জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভর করে, যা পরিবেশ দূষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এছাড়া ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের উদ্যোগ চলছে। ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় ঢাকা ধারাবাহিকভাবে শীর্ষে রয়েছে। বিদ্যুৎ চালিত মেট্রোরেল রাজধানীর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের উপর চাপ কমিয়ে পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

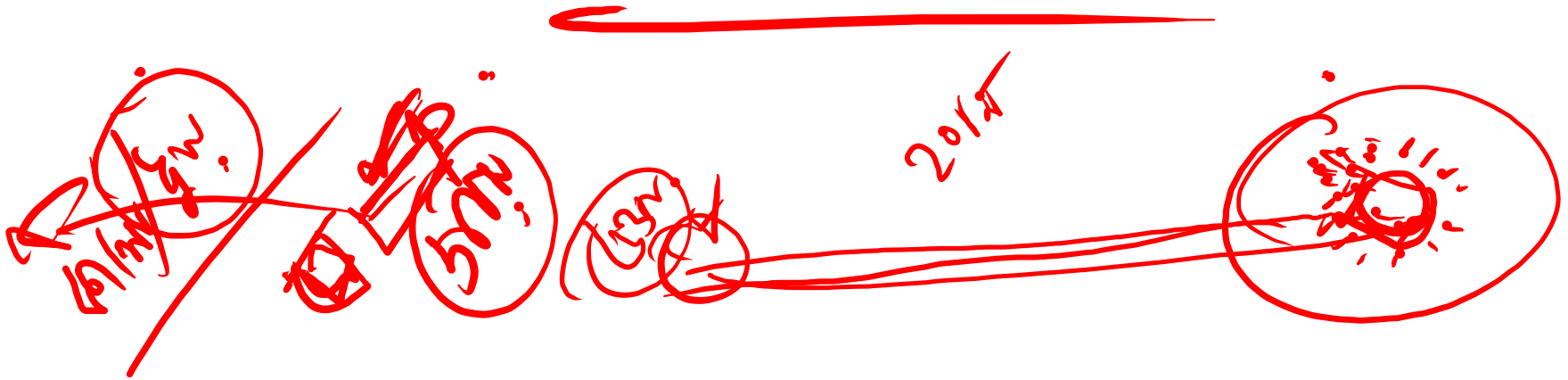

মেগা প্রকল্প

পদ্মা সেতু রেল-সংযোগ

অনুমোদন	একনেক সভায় ০৩ মে, ২০১৬	**উন্নয়ন সহযোগী**	চীনা এক্সিম ব্যাংক, চীন
নির্মাণ কাজ শুরু	২০১৮	**মালিকানা**	রেলপথ মন্ত্রণালয়
সম্ভাব্য উদ্বোধন	জুন, ২০২৪	**প্রকল্পের ধরন**	জি টু জি
অবস্থান	ঢাকা থেকে যশোর	**ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান**	চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
সম্ভাব্য ব্যয়	৪.১ বিলিয়ন ডলার; বৈদেশিক ঋণ ২.১ বিলিয়ন ডলার; বাংলাদেশ সরকার ২ বিলিয়ন ডলার	**দৈর্ঘ্য**	১৬৯ কিলোমিটার
		লাইনের ধরন	ব্রডগেজ

মেগা প্রকল্প

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

জিডিপি বৃদ্ধি: রেলের সমীক্ষা অনুযায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষিণের ২১ জেলার উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াবে। ফলে জিডিপি ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

- ✓ **ভারী রেল চলাচলের অসুবিধা দূর হবে:** বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে ভারী মালবাহী ট্রেন চলাচল করতে পারে না। ঐ সেতুতে ট্রেনের গতিও সীমিত। ফলে বেনাপোল স্থলবন্দরের মালামাল ট্রেনে পরিবহণ করা যায় না। নতুন রেললাইন হলে দূরত্ব কমবে, ভারী মালবাহী ট্রেন চলাচল বাড়বে।
- ✓ **দূরত্ব ও সময় হ্রাস:** ঢাকা থেকে খুলনা রেলপথে বঙ্গবন্ধু ও লালনশাহ সেতু হয়ে যেতে হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ঢাকা থেকে খুলনার দূরত্ব ২১২ কিলোমিটার হ্রাস পাবে। ফলে এই যাত্রার সময় ১১ ঘণ্টা থেকে ৪ ঘণ্টায় নেমে আসবে।

মেগা প্রকল্প

- ✓ **বরিশাল বিভাগে রেল সংযোগ:** ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের ৬৪ জেলাকে রেলসংযোগের আওতায় আনার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে বরিশাল বিভাগে কোন রেল সংযোগ লাইন নেই। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চল সড়ক পথে যুক্ত হলো। এই সেতু ব্যবহার করে নির্মিত রেল প্রকল্পটি বরিশাল বিভাগে রেলসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের শতভাগ জেলা রেলের আওতায় আনতে সহায়তা করবে।

- ✓ **পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি:** রেলপথে পণ্য পরিবহণ সময় ও খরচ সাশ্রয়ী। বর্তমানে সড়ক পথে দক্ষিণের সাথে কেন্দ্র সংযুক্ত থাকলেও রেল পথে যুক্ত নয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষিণের পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি এবং দক্ষিণে অবস্থিত ৩ টি স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

মেগা প্রকল্প

বঙ্গবন্ধু টানেল

অনুমোদন	ECNEC সভায় ১২ নভেম্বর, ২০১৫		
নির্মাণ কাজ শুরু	২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯		
সম্ভাব্য উদ্বোধন	অক্টোবর, ২০২৩		
অবস্থান	চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা ও আনোয়ারা উপজেলা; চীনের সাংহাই শহরের আদলে কর্ণফুলীর দুই পাশের দুটি নগরী মিলে হবে এক শহর (One City, Two Town)		
সম্ভাব্য ব্যয়	১ বিলিয়ন ডলার; যার মধ্যে ০.৭ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ এবং বাকিটা বাংলাদেশ সরকার		
উন্নয়ন সহযোগী	চায়না এক্সিম ব্যাংক (২ শতাংশ সুদে)	মালিকানা	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
ধরন	জি-টু-জি	দৈর্ঘ্য	৩.৪ কিলোমিটার (২ টিউব)
এপ্রোচ রোড	৫ কিলোমিটার	টিউবের ব্যাস	১৩.৮০ মিটার
গভীরতা	কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেলের সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫০ মিটার	নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	চায়না কমিউনিকেশন কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড (CCCC)

মেগা প্রকল্প

টানেল নির্মাণের প্রযুক্তি

'শিল্ড ড্রাইভেন মেথড' পদ্ধতিতে এই টানেল নির্মাণ হচ্ছে। টিবিএম বা টানেল বোরিং মেশিনটি প্রকল্পের পশ্চিম প্রান্তের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করানোর পর টানেল নির্মাণ করে আনোয়ারা প্রান্ত দিয়ে বের হবে। ব্যবহৃত মেশিনটি চীনা কোম্পানি 'টানহেং মেকানিক্যাল' চীনের জিয়াংসু প্রদেশের কারখানায় প্রস্তুত করেছে। ১২ দশমিক ১২ মিটার ব্যাসের মেশিনটি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় বোরিং মেশিন। বাংলাদেশের জন্য চীনের তৈরি এই টিবিএমটির দৈর্ঘ্য ৯৪ মিটার এবং এটির ওজন ২২ হাজার টনের বেশি।

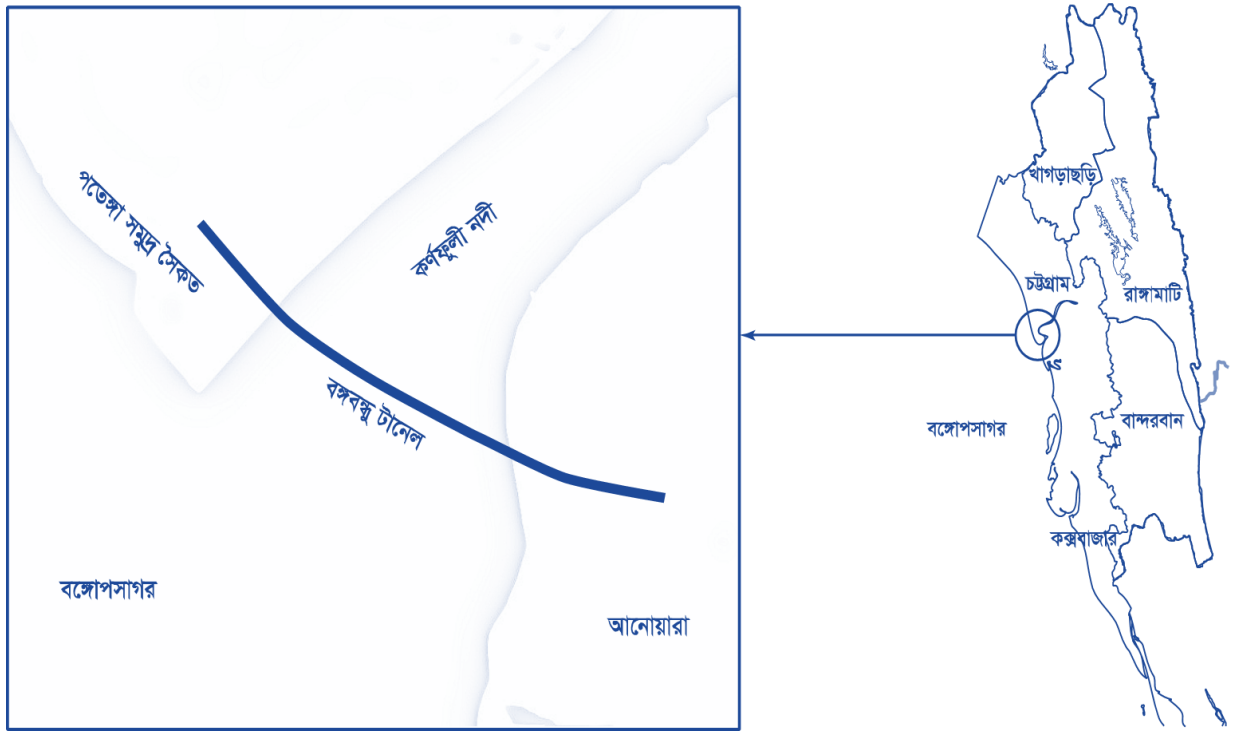

মেগা প্রকল্প

অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব

- **চট্টগ্রাম কক্সবাজারের দূরত্ব হ্রাস:** বঙ্গবন্ধু টানেল কক্সবাজারের সঙ্গে চট্টগ্রামের দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার কমিয়ে দেবে। কক্সবাজার ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের গাড়ি চট্টগ্রাম শহরকে এড়িয়ে সুড়ঙ্গপথ দিয়েই রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে চলাচল করতে পারবে। তাহলে চট্টগ্রাম নগরীর যানজটও অনেকাংশে কমে যাবে।

- **দক্ষিণ চট্টগ্রামে শিল্পায়ন:** টানেলের কারণে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও বন্দরের কার্যক্রম প্রসারিত হবে। আনোয়ারা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত গড়ে উঠবে নতুন নতুন অঞ্চল। এ ছাড়া মিরসরাইয়ের বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ পর্যন্ত শিল্প করিডর (সড়ক ঘিরে শিল্পায়ন) হবে।

- **চট্টগ্রাম নগরীর উপর চাপ কমানো:** টানেলে যান চলাচল শুরু হলে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কক্সবাজার ও দক্ষিণ চট্টগ্রামগামী গাড়িগুলোকে আর নগরে প্রবেশ করতে হবে না। চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড হয়ে টানেলের মাধ্যমে দ্রুত সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। এর ফলে চট্টগ্রাম নগরেও যানবাহনের চাপ কমে যাবে।

মেগা প্রকল্প

জিডিপি-তে ইতিবাচক প্রভাব: কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে এলাকার আশে পাশে শিল্পোন্নয়ন, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। এই টানেল দেশের জিডিপি ০.১৬৬ শতাংশ বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। DPP মোতাবেক এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে Financial এবং Economic IRR এর পরিমান দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬.১৯% এবং ১২.৪৯%। তাছাড়া, Financial ও Economic "Benefit Cost Ratio (BCR)" এর পরিমাণ দাড়াবে যথাক্রমে ১.০৫ এবং ১.৫০। ফলে কর্ণফুলী টানেল নির্মিত হলে জিডিপি তে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এশিয়ান হাইওয়ের অংশ: কর্ণফুলী টানেল নির্মাণের ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে এবং এশিয়ান হাইওয়ের সাথে সংযোগ স্থাপিত হবে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে। কর্ণফুলী নদীর পূর্বপ্রান্তের প্রস্তাবিত শিল্প এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত চট্টগ্রাম শহর, চট্টগ্রাম বন্দর ও বিমানবন্দরের সাথে উন্নত ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে।

মেগা প্রকল্প

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর

অনুমোদন	একনেকে ১০ মার্চ, ২০২০		
নির্মাণ কাজ শুরু	১৬ নভেম্বর, ২০২০		
সম্ভাব্য উদ্বোধন	ডিসেম্বর, ২০২৬		
অবস্থান	মাতারবাড়ী, মহেশখালী, কক্সবাজার		
সম্ভাব্য ব্যয়	১.৮ বিলিয়ন ডলার; যার মধ্যে জাইকা- ১.৪ বিলিয়ন ডলার, সরকারি তহবিল- ৬৫১ মিলিয়ন ডলার, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন- ২৩৪ মিলিয়ন ডলার;		
মালিকানা	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	**নির্মাতা প্রতিষ্ঠান**	কনসোর্টিয়াম, জাপান
উন্নয়ন সহযোগী	জাইকা, জাপান	**গভীরতা**	১৮ মিটার

বন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় জেটি নির্মাণ

প্রকল্প প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দরে ৩০০ ও ৪৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের দু'টি টার্মিনাল থাকবে। এর একটি হবে বহুমুখী টার্মিনাল ও অপরটি কন্টেইনার টার্মিনাল। এছাড়া, বন্দরের সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হবে। একসঙ্গে ৮ হাজার কন্টেইনারবাহী জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারবে।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **কনটেইনারে সাশ্রয়:** চট্টগ্রাম বন্দরের তুলনায় মাতারবাড়ী সমুদ্রপথে প্রতি ২০ ফুট লম্বা কনটেইনারে খরচ সাশ্রয় হবে ১৩১ ডলার এবং ৪০ ফুটের কনটেইনারে সাশ্রয় হবে ১৯৭ ডলার।

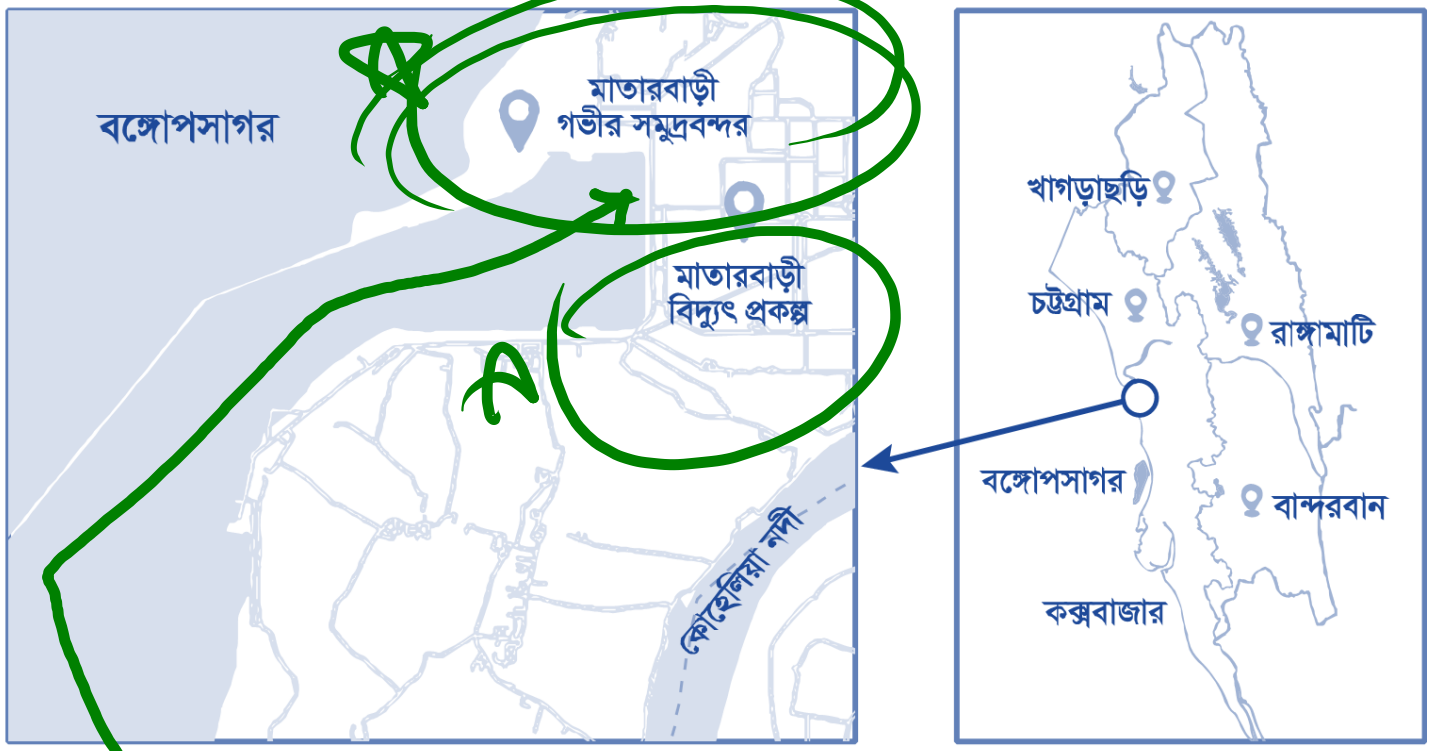

মেগা প্রকল্প

- **পণ্য খালাসে কম জাহাজের প্রয়োজন:** চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের হিসাব মতে, ২০২০ সালে ১ হাজার ৩৭৮টি জাহাজে ২৬ লাখ কনটেইনার আনা-নেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ফলে এই পরিমাণ কনটেইনার পরিবহনে ১৬১ থেকে ২০০ টি জাহাজ প্রয়োজন হবে।

- **চট্টগ্রাম বন্দরের উপর চাপ হ্রাস:** দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯২ ভাগ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। এই বন্দরের চারটি টার্মিনাল সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যার কারণে এই বন্দরে পণ্য আনা নেয়ার পরিমাণ বৃদ্ধির কোন উপায় নেই। তাই চট্টগ্রাম বন্দরের উপর চাপ কমাতে মাতারবাড়ী বন্দর বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

- **পণ্য খালাসের সময় হ্রাস:** চট্টগ্রাম বন্দরে চীন থেকে আসা জাহাজের পণ্য খালাস করতে প্রথমে জাহাজ থেকে লাইটারে এবং পরে লাইটার থেকে জেটিতে আনা হয়। ফলে ৩ মাসের মত সময় লেগে যায়। মাতারবাড়ীতে জাহাজ থেকে সরাসরি বন্দরে পণ্য খালাস করানো যাবে ফলে সময় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে।

মেগা প্রকল্প

দোহাজারী – কক্সবাজার রেল প্রকল্প

অনুমোদন	একনেকে ৬ জুলাই, ২০১০
নির্মাণ কাজ শুরু	১ মার্চ, ২০১৮
সম্ভাব্য উদ্বোধন	ডিসেম্বর, ২০২৩
অবস্থান	দোহাজারী, চট্টগ্রাম- রামু, কক্সবাজার
সম্ভাব্য ব্যয়	১.৯ বিলিয়ন ডলার; বৈদেশিক ঋণ ১.৪ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশ সরকার ৫১৮ মিলিয়ন ডলার
উন্নয়ন সহযোগী	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)
মালিকানা	রেলপথ মন্ত্রণালয়
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেড
লাইনের ধরন	ডুয়েল গেজ
দৈর্ঘ্য	১০০ কিলোমিটার
স্টেশন সংখ্যা	৯ টি

মেগা প্রকল্প

অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **ঢাকা থেকে কক্সবাজার উচ্চগতির রেলের সুযোগ:** পরিকল্পনা প্রতিবেদন আনুযায়ী মিটার গেজ লাইনে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার এবং ব্রডগেজ লাইনে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে ট্রেন চলাচল করতে পারবে।

- **সড়ক পথের উপর চাপ হ্রাস:** পর্যটন নগরী কক্সবাজার যাওয়ার জন্য বর্তমানে একমাত্র উপায় সড়ক পথ। ঢাকা থেকে রেলে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভ্রমণ সম্ভব হলেও চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারে বর্তমানে কোন রেলপথ নাই। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রেলের মাধ্যমে সরাসরি ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাতায়াত সম্ভব হবে যা চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটের সড়কের উপর চাপ কমাবে।

ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে (চট্টগ্রাম-মিয়ানমার)

দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন

মেগা প্রকল্প

- **ট্রান্স এশিয়ান রেলের সাথে সংযুক্তি:** ট্রান্স এশিয়ান রেলে যুক্ত হওয়ার জন্য চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের রামু হয়ে মিয়ানমারের ঘুমধুম পর্যন্ত রেললাইনের প্রয়োজন ছিল। প্রকল্পের শুরুতে দোহাজারী থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত ১২৮ কিলোমিটারের রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হলেও মিয়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা সমস্যার কারণে রামু থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত ২৮ কিলোমিটারের কাজ আপাতত বন্ধ। প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে ঢাকা থেকে সরাসরি মিয়ানমার পর্যন্ত রেলসংযোগ স্থাপিত হবে।

- **বাণিজ্যে অগ্রগতি:** কক্সবাজার থেকে কেন্দ্রে বা দেশের অন্য যে কোন স্থানে পণ্য আনা নেয়ার জন্য এই রেল সংযোগ বিশেষ ভূমিকা রাখবে। যা কক্সবাজার জেলায় শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

- **পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন:** রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কম খরচে এবং কম সময়ে চট্টগ্রাম নগরীর জ্যাম উপেক্ষা করে সরাসরি কক্সবাজার পৌঁছানোর সুবিধার ফলে কক্সবাজারের মূল আকর্ষণ সমুদ্র সৈকতসহ অন্যান্য স্থানে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

মেগা প্রকল্প

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

চুক্তি	১৫ জানুয়ারি, ২০১৩ (স্টেট এক্সপোর্ট ক্রেডিট)
নির্মাণ কাজ শুরু	২ অক্টোবর, ২০১৩
সম্ভাব্য উদ্বোধন	২০২৪
অবস্থান	রূপপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা
সম্ভাব্য ব্যয়	১১.৩ বিলিয়ন ডলার; বৈদেশিক ঋণ ১১ বিলিয়ন ডলার, বাকি অংশ বাংলাদেশ সরকার
মালিকানা	বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি কমিশন
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	অ্যাটমস্ট্রয় এক্সপোর্ট, রাশিয়া
উন্নয়ন সহযোগী	রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক Development and Foreign Economic Affairs (VEB) (৪ শতাংশ সুদে, ১০ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ২৮ বছর সময়)
জ্বালানি	সাধারণ নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরে Uranium-233, Uranium-235 এবং Plutonium-239 ব্যবহৃত হয়। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে Uranium-235 ব্যবহৃত হবে।
ক্ষমতা	২৪০০ মেগাওয়াট (১২০০ মেগাওয়াটের ২টি চুল্লি)
চুল্লির ধরন	VVER-1200MW মডেলের চুল্লি Pressurized Water Reactor। এই চুল্লিতে তাপ পরিবাহক হিসাবে ১৫০ ATM চাপের উচ্চচাপীয় পানি ব্যবহৃত হয়।
প্লান্টের স্থায়িত্ব	৫০ বছর

মেগা প্রকল্প

প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

- **দেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ:** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে মিশ্র জ্বালানি নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশের বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ৯ শতাংশ এই প্রকল্প সরবরাহ করবে।
- **৬ কোটি উপকারভোগী:** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে প্রায় ১৯.৩৪ বিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে, যা ৬ কোটি মানুষ অথবা ১.৫ কোটি পরিবারের বার্ষিক বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সক্ষম।
- **নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎস:** জলবায়ু সংকট সমাধানে নির্ভরযোগ্য শক্তির উৎসের মধ্যে পারমাণবিক শক্তি অন্যতম। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে সঞ্চিত শক্তি কাজে লাগিয়ে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে দীর্ঘমেয়াদে নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং অন্যান্য বিকল্প অপেক্ষা সাশ্রয়ী মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমান বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।
- **কম মূল্যে বিদ্যুৎ:** প্রতি ঘণ্টা প্লান্ট চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হবে ৮ থেকে ১৪ ডলার। ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় বিক্রয়মূল্য হচ্ছে ৬ দশমিক ৩২ সেন্ট, যা বিশ্বের গড় বিক্রয়মূল্য (১০ সেন্ট) থেকে শতকরা প্রায় ৩৭ শতাংশ কম।

মেগা প্রকল্প

মৈত্রী সুপার থার্মাল (রামপাল) পাওয়ার প্রকল্প

জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি	২৯ জানুয়ারি, ২০১২		
নির্মাণ কাজ শুরু	২৪ এপ্রিল, ২০১৭		
উদ্বোধন	৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ (১ম ইউনিট)		
অবস্থান	রামপাল, বাগেরহাট, খুলনা		
সম্ভাব্য ব্যয়	১৬,০০০ কোটি টাকা; ঋণসহায়তা – ১.৪ বিলিয়ন ডলার, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (ইক্যুইটি)- ১৬৯ মিলিয়ন ডলার এবং এনটিপিসি লি., ভারত (ইক্যুইটি) - ১৬৯ মিলিয়ন ডলার।		
মালিকানা	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং এনটিপিসি লি., ভারত (ইক্যুইটি)	**জ্বালানি**	কয়লা
ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান	ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন, ভারত এবনফ ভারত হেভি ইলেট্রিক্যালস লিমিটেড (BHEL), ভারত।	**ক্ষমতা**	১৩২০ মেগাওয়াট (২ টি ইউনিট ৬৬০x২)
বাস্তবায়ন	Bangladesh – India Friendship Power Company Ltd.	**উন্নয়ন সহযোগী**	এক্সিম ব্যাংক, ভারত
অর্থের যোগান	ঋণ – ৭০% (ECF); ইক্যুইটি : ৩০% (BPDB, NTPC প্রত্যেকে ১৫% হারে)		

মেগা প্রকল্প

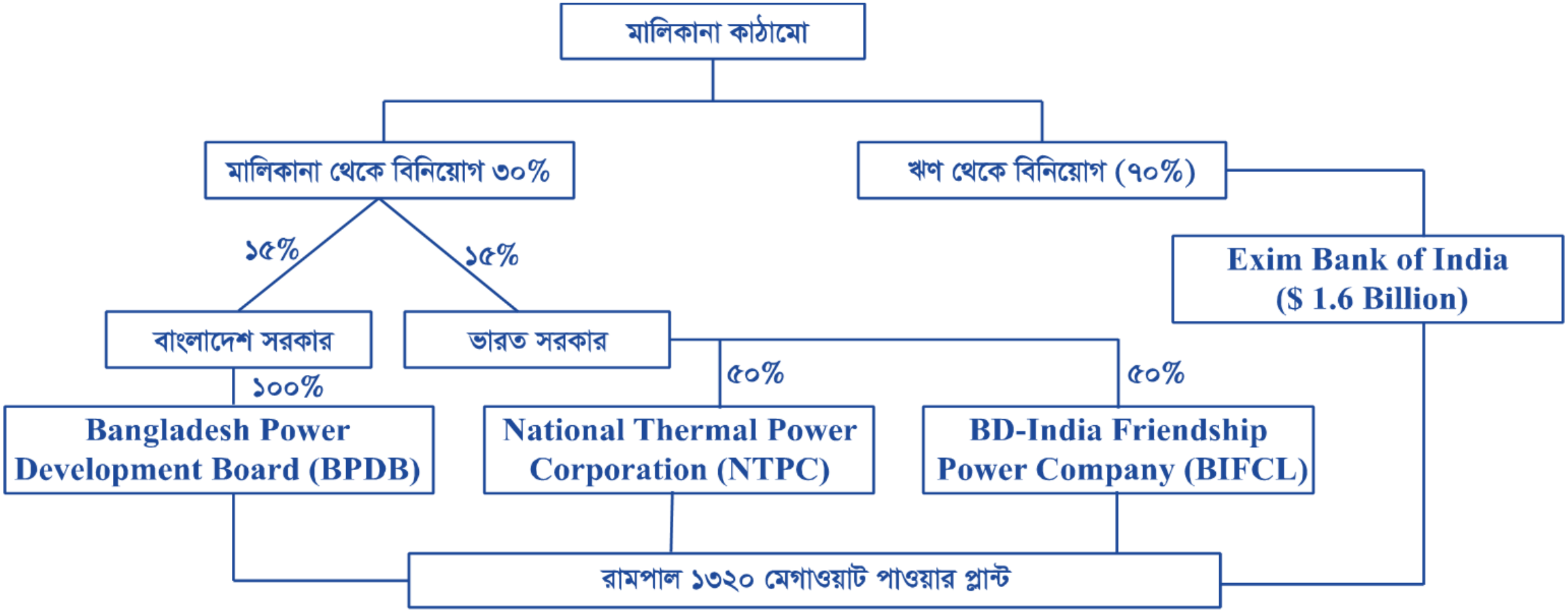
মালিকানা কাঠামো
মালিকানা থেকে বিনিয়োগ ৩০%
ঋণ থেকে বিনিয়োগ (৭০%)
১৫%
১৫%
Exim Bank of India
($ 1.6 Billion)
বাংলাদেশ সরকার
ভারত সরকার
১০০%
৫০%
৫০%
Bangladesh Power Development Board (BPDB)
National Thermal Power Corporation (NTPC)
BD-India Friendship Power Company (BIFCL)
রামপাল ১৩২০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট

আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি

কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং সেই বাষ্প ব্যবহার করে টারবাইন ঘুরানো হয়, যা এর সাথে সংযুক্ত জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ তৈরি করে। সাধারণ কয়লা চালিত প্লান্টে এই কাজের জন্য কর্মদক্ষতা পাওয়া যায় প্রায় ২৮ শতাংশ। কিন্তু সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত পানির তাপমাত্রা ও চাপ থাকে পানির ক্রিটিক্যাল তাপমাত্রার এবং চাপের উপর; ফলে প্লান্টের কর্মদক্ষতা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ শতাংশ। সাব ক্রিটিক্যাল ও আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্লান্টের মধ্যে তুলনা-

বিবরণ	সাব ক্রিটিক্যাল	আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল
কর্মদক্ষতা	২৮	৪৫
সালফার অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড (kg/MWh)	০.১২৭	০.১১৮
কার্বন ডাই অক্সাইড (kg/MWh)	৯০০	৮৩৬
ফ্লু গ্যাস	৩.৪ মিলিয়ন	৩.১ মিলিয়ন

মেগা প্রকল্প

পরিবেশ দূষণরোধে কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী এর মতে, রামপালে যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং যেসব দূষণবিরোধী পদক্ষেপ বা মিটিগেটিং মেজারস নেয়া হয়েছে তাতে সুন্দরবনের বা পরিবেশের কোনও বড় ঝুঁকি থাকবে না। জাতিসংঘ ও ইউনেস্কো আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি সমর্থন করে কারণ এতে কয়লা কম ব্যবহৃত হয় এবং এতে কার্বন নিঃসরণও কম। পাশাপাশি কয়লা পোড়ানোর ফলে নির্গত সালফার অক্সাইড ও নাইট্রাস অক্সাইডও বাতাসে মিশতে পারে না। তাই রামপালে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে।

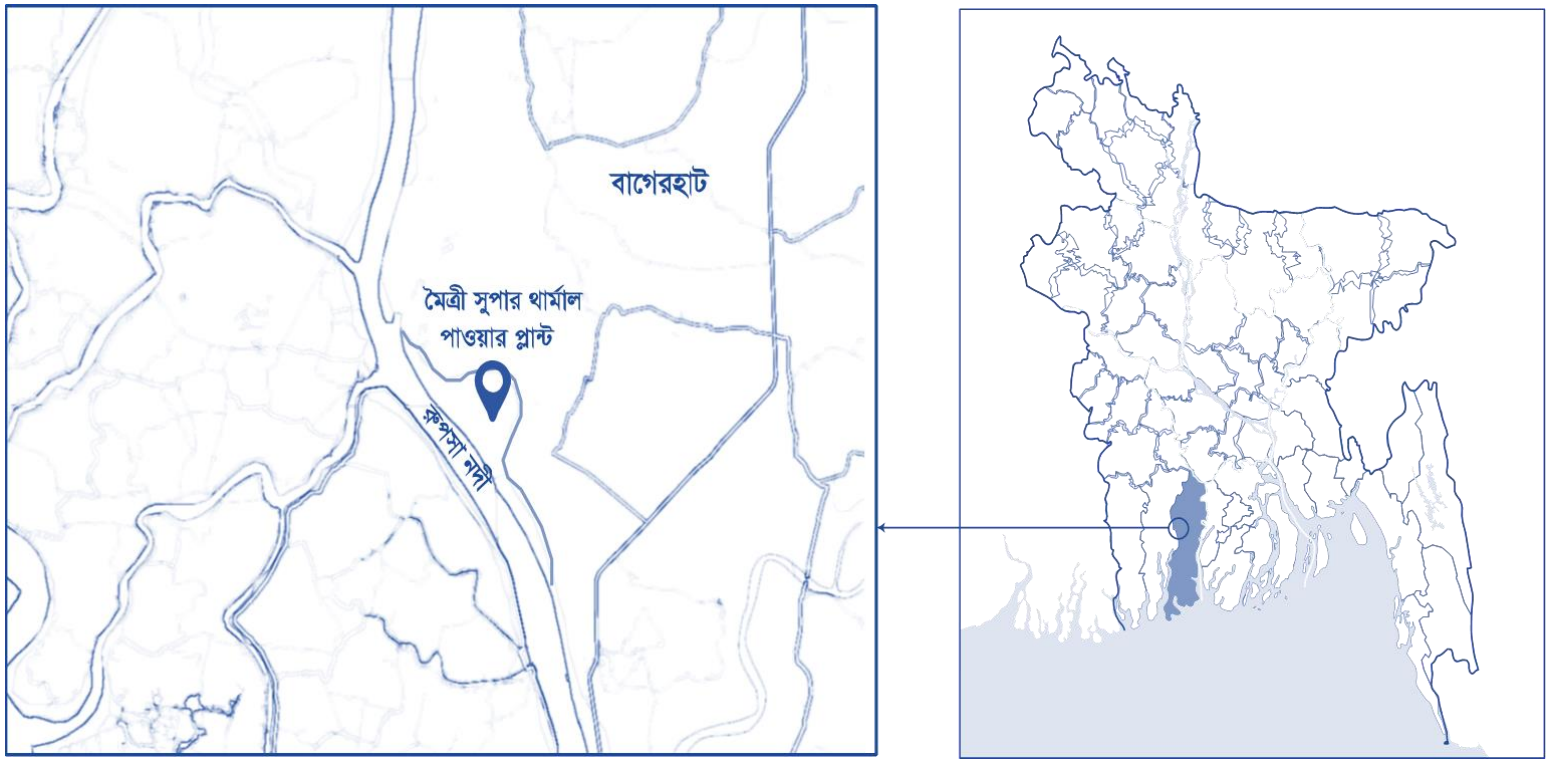

মেগা প্রকল্প

পানি সরবরাহ

শুষ্ক মৌসুমে রুপসা নদীর প্রবাহিত পানির ২০,০০০ ভাগের ১ ভাগ ব্যবহৃত হবে। পানির ব্যবহার সীমিত করতে ওয়াটার রিসাইকেল পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবহৃত পানি পুনঃপুনঃ ব্যবহার হবে। নদী দূষণ রোধে গরম পানি বা অপরিশোধিত পানি নদীতে ফেলা হবে না।

দক্ষিণের অর্থনৈতিক উপকারিতা

পদ্মাসেতু নির্মাণের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণের ২১ জেলা কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত হলো, ফলে দক্ষিণবঙ্গ শিল্পায়নের পথে একধাপ এগিয়ে গেল। শিল্পায়নের জন্য যোগাযোগের পাশাপাশি বিদ্যুতের প্রয়োজন। বিদ্যুতের এই চাহিদা পূরণে রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মেগা প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (দ্বিতল সেতু)		
প্রকল্প পরিচালক	মোঃ শফিকুল ইসলাম		
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	৪ জুলাই, ২০০১		
সেতুর কাজ শুরু	৭ ডিসেম্বর, ২০১৪		
সেতুর কাজ উদ্বোধন	১২ ডিসেম্বর, ২০১৫		
অবকাঠামো অবস্থিত	৩টি জেলায়; মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে		
প্রকল্পে মোট ব্যয়	৩০ হাজার ১৯৩.৩৯ কোটি টাকা		
মূল সেতু নির্মাণে ব্যয়	১১ হাজার ৯৩৮.৬৩ কোটি টাকা	**পাইল সংখ্যা**	২৯৪টি
নদী শাসন অঞ্চল	১২ কিলোমিটার	**ব্যবহৃত ক্রেন**	তিয়ান-ই (ধারণক্ষমতা : ৩৬০০ টন)
নদীশাসন ব্যয়	৮ হাজার ৭০৬. ৯১ কোটি টাকা	**নকশা প্রণয়ন করে**	AECOM
সেতুর আয়ুষ্কাল	১০০ বছর	**প্রস্থ**	১৮.১০ মি
ভূমিকম্প সহ্যমাত্রা	রিখটার স্কেলে ৯	**পিলার সংখ্যা**	৪২টি
দৈর্ঘ্য	৬.১৫ কিমি	**নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান**	চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড

মেগা প্রকল্প

পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

- **GDP প্রবৃদ্ধি:** পদ্মা সেতুর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। এর ফলে জাতীয় GDP প্রবৃদ্ধি ১.২৩% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়। পদ্মাসেতুতে রেল চালু হলে ২.০৩% GDP বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণাঞ্চলের GDP বাড়বে ২.৩%। এছাড়া পদ্মা সেতুতে বিনিয়োগের অর্থনৈতিক প্রভাব দাঁড়াবে বছরে ১৮.২২%।
- **দারিদ্র্য হ্রাস:** পদ্মা সেতু দেশের ৩ বিভাগের ২১টি জেলার প্রায় ৬ কোটি জনগণকে ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত করেছে। এতে প্রতিবছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। যা আঞ্চলিক ভাবে ১.২৫%।
- **টোল আদায়:** পদ্মা সেতুর ফলে মাওয়া-জাজিরা রুটে ফেরি খরচ ৪০০ মিলিয়ন ডলার ভর্তুকি সাশ্রয় হবে। টোল হতে আদায় হবে প্রতি বছর ৪০০০ মিলিয়ন ডলার। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও ফাইবার অপটিক্যাল লাইন সেতুর মধ্য দিয়ে নেয়ার ফলে ২৭১ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে।
- **নদী ভাঙন রোধ:** পদ্মা সেতুতে নদী শাসনের ফলে ৯০০০ হেক্টর পরিমাণ জমি ক্ষয় রোধ ও বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। যার অর্থমূল্য প্রায় ১৫৬ মিলিয়ন ডলার।

মেগা প্রকল্প

- **পরিবহন যাতায়াত বৃদ্ধি:** পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে ঢাকার বা পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতায়াতের সময় এক-চতুর্থাংশে কমে আসছে। যার ফলে প্রচুর পরিমাণে পরিবহণ যাতায়াত করছে। এতে অতি অল্প সময়ে কম খরচে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে আগামী ৩১ বছরে সাশ্রয় হবে ১২৯৫০০ কোটি টাকা। যা অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনবে।

সেতু হয়ে দৈনিক পরিবহণ চলাচলের সম্ভাব্য তালিকা

সাল	২০২৩	২০৩০	২০৩৫	২০৫০
পরিবহণ চলাচলের পরিমাণ	২৫৩০০ টি	৩৭০০০ টি	৪৫০০০ টি	৬৭০০০ টি

- **আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি :** পৃথিবীর ১১তম বৃহত্তম ও এশিয়ার ষষ্ঠ বৃহত্তম সেতুটি এশিয়ান হাইওয়ে ও ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ায় আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

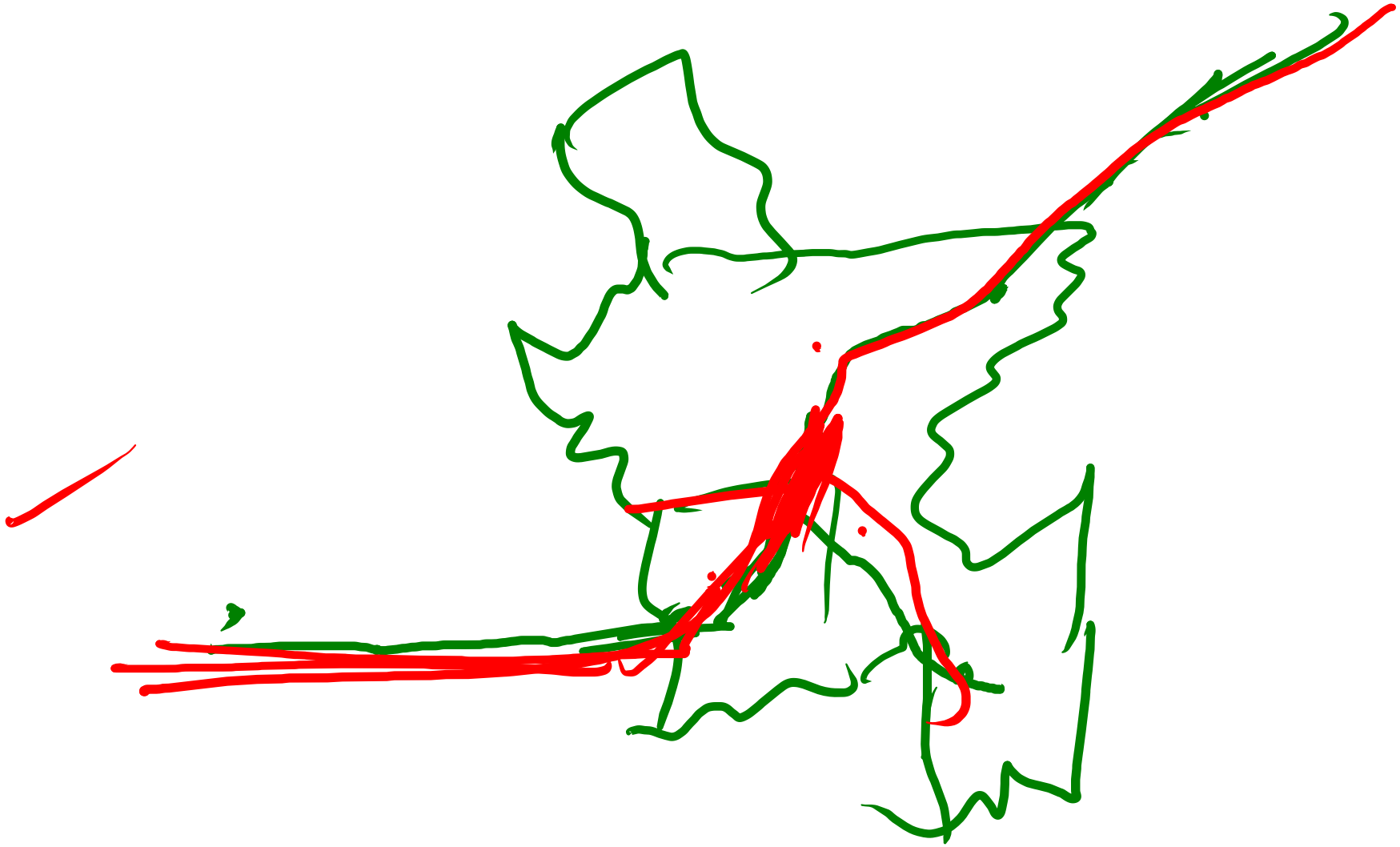

মেগা প্রকল্প

- **পর্যটন শিল্পের বিকাশ :** পদ্মা সেতুর ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এতে দক্ষিণাঞ্চলের কুয়াকাটা ও সুন্দরবনসংলগ্ন ছোট ছোট বিভিন্ন দ্বীপ মালদ্বীপের মতো পর্যটন উপযোগী করা যাবে। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, সুন্দরবন ও পায়রা বন্দরকে ঘিরে দেখা দেবে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা। পদ্মা সেতুর ফলে কক্সবাজারের চেয়ে কম সময়ে সুন্দরবন ও কুয়াকাটায় পৌঁছানো সম্ভব হবে। কক্সবাজার যেতে যেখানে সময় লাগে ১০-১২ ঘণ্টা, সেখানে কুয়াকাটায় পৌঁছানো যাবে মাত্র ছয় ঘণ্টায়, ফলে নিঃসন্দেহে পর্যটকের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে।

- **কৃষি ও শিল্পে অবদান :** পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম পাইলিং (১২২ মিটার) সম্পন্ন এ সেতুটি অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ২৯%, কৃষিখাতে ৯.৫% এবং উৎপাদন ও পরিবহণ খাতে ৮% প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

- **কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি :** রাজধানীর সাথে দক্ষিণাঞ্চল ও মোংলা বন্দরের সরাসরি সংযোগ হওয়াতে স্থানীয় জনগণের নতুন নতুন ব্যবসা ও প্রায় ২ কোটি কর্মসংস্থান বাড়বে। সেতুটির মাধ্যমে বছরে বিনিয়োগের ১৯% উঠে আসবে টোল থেকে।

মেগা প্রকল্প

চ্যালেঞ্জসমূহ

- ✓ মোংলা ও পায়রা বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানের করা।
- ✓ সংযোগ সড়কগুলোর উন্নয়ন।
- ✓ দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য নদীর উপর সেতু তৈরি।
- ✓ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন।
- ✓ পর্যাপ্ত মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সংজ্ঞা

সরকারি, বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বা যৌথ মালিকানায় কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত, পরিচালিত, সম্প্রসারণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে আয় প্রবাহ নিশ্চিতকরণের কার্যক্রমকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা PPP বলে। দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে যৌথভাবে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ও লক্ষ্যভিত্তিক কার্যসম্পর্ক গড়ে তোলাকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership PPP) বলা হয়।

PPP হলো চুক্তিভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণে কোনো প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার একটি সময়োপযোগী কৌশল বা প্রক্রিয়া। এরূপ অংশীদারিত্ব বা পরিকল্পনা বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছে। ইদানীং পিপিপি'র অধীনে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই এগিয়ে চলছে। যেমন: বিদ্যুৎ উৎপাদন, টোল সড়ক ইত্যাদি।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

উদ্দেশ্যসমূহ

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- ✓ উন্নয়নের গতিপথকে যৌথ অর্থায়নে দীর্ঘমেয়াদিভাবে সুদৃঢ়করণ ও বিনিয়োগকে বর্ধিতকরণ।
- ✓ দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভবিষ্যতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা।
- ✓ জনসাধারণকে টেকসই বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা।
- ✓ ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ✓ অর্থ, কর্মের চাহিদা ও যোগানের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধান করা।
- ✓ দেশের জনসেবাকে অধিকতর যুগোপযোগী করে গড়ে তুলে জনকল্যাণ বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করা।
- ✓ দীর্ঘমেয়াদি আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ধারায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ✓ দেশে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যমান অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও উন্নয়নে সহায়তা করা।
- ✓ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্বালানি ও সড়ক, যোগাযোগ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা।
- ✓ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অতি জরুরি খাতসমূহে বিনিয়োগ ও উন্নয়নে স্থিতিশীলতা আনয়ন করা।
- ✓ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বের বিনিয়োগকে শক্তিশালী করা এবং যৌথভাবে বিনিয়োগ ঝুঁকি বহন করা।

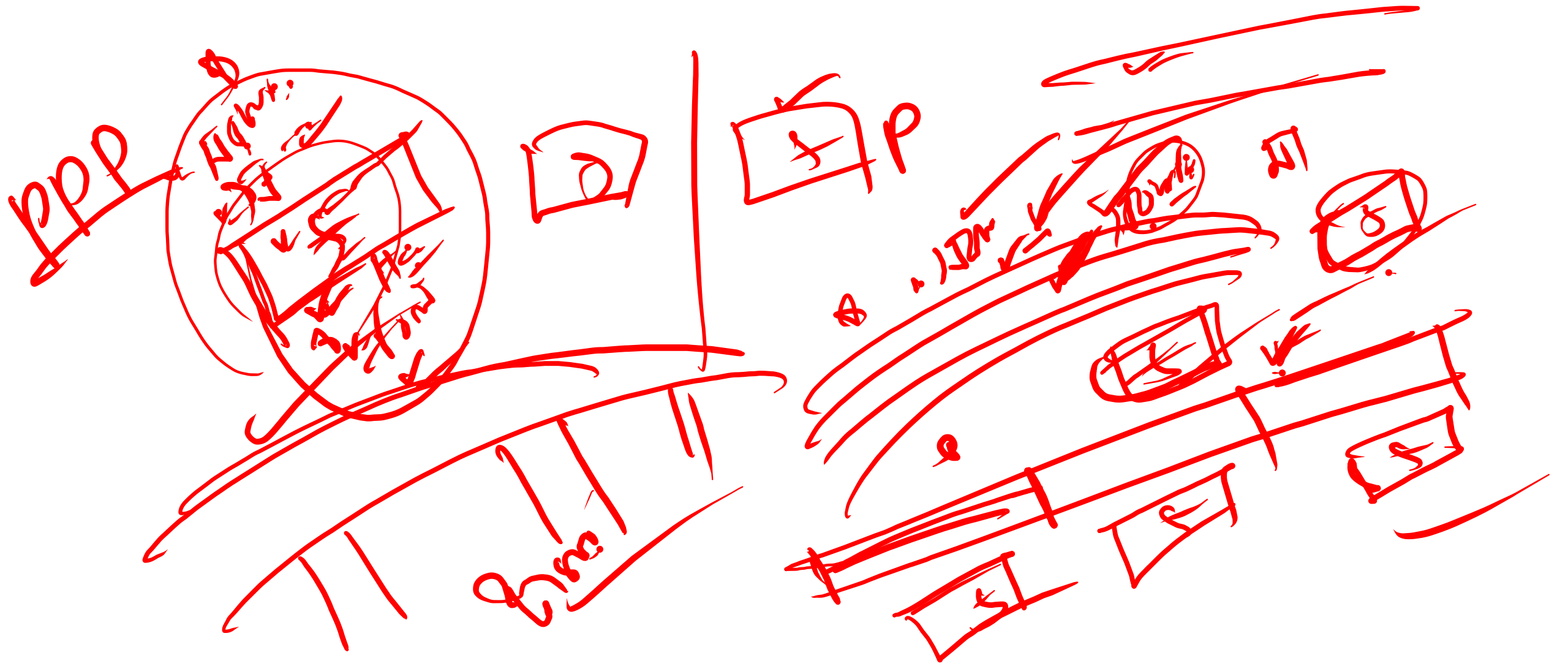

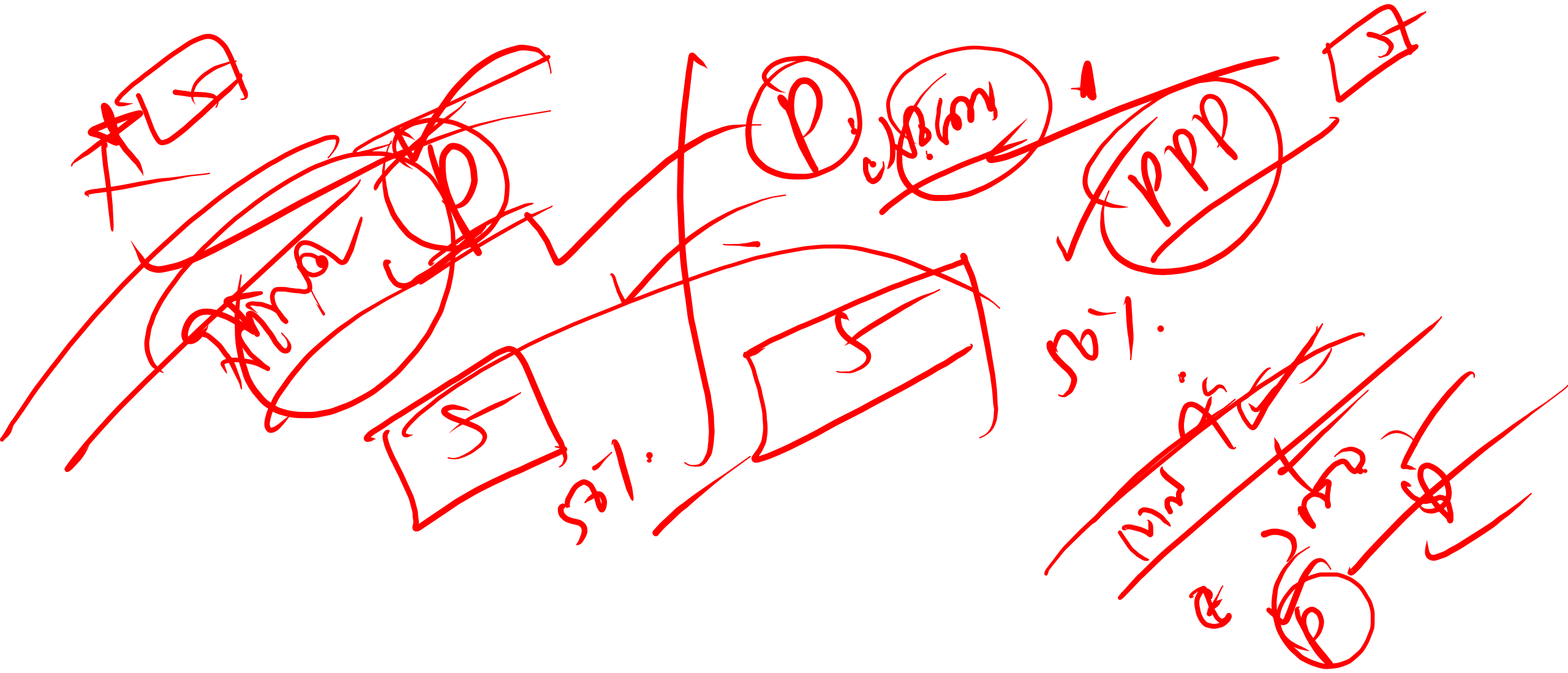

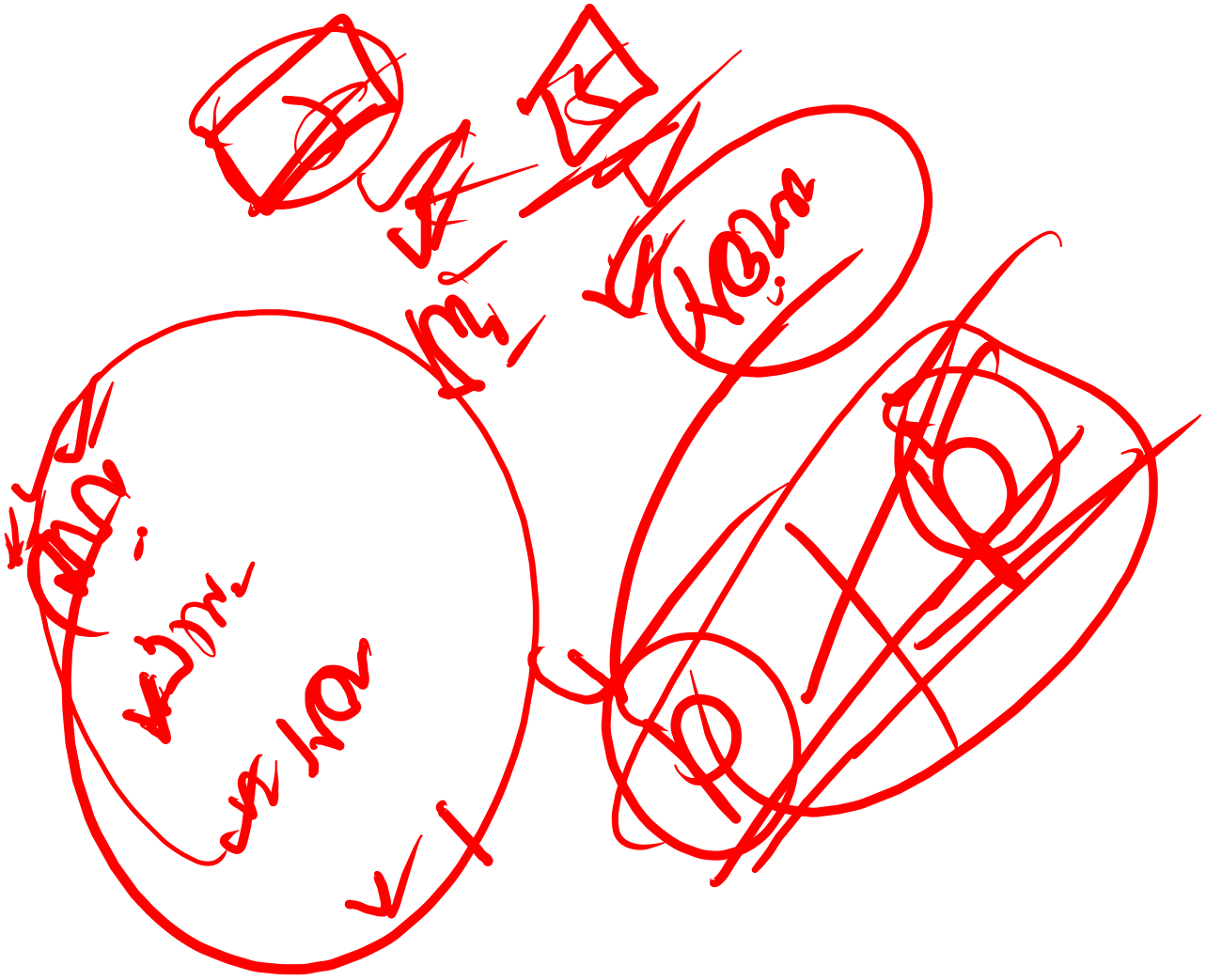

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

সরকারি-বেসরকারি (পিপিপি) প্রকল্পে উন্নয়ন প্রক্রিয়া

- এখন দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রয়াসে নানাবিধ কৌশল গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারি সেক্টরের প্রবেশাধিকার রয়েছে। সাধারণভাবে সরকার একদিকে নিজের ইচ্ছামতো অবকাঠামোগত অথবা অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফা প্রাপ্তির পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে, বেসরকারি সেক্টরের জন্য শুধু অ-অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ এবং তা থেকে মুনাফার সংস্থান করার সুযোগ উন্মুক্ত থাকে।
- যেকোনো প্রকল্পে অর্থায়ন দুইভাবে হতে পারে। যথা: সরকারি অর্থায়নে গঠিত সরকারি অবকাঠামো প্রকল্প অথবা বেসরকারি অর্থায়নে গঠিত বেসরকারি অবকাঠামো প্রকল্প। সরকারি অবকাঠামো প্রকল্পগুলোর জন্য অর্থায়ন, মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত সরকার নিজেই নিয়ে থাকে। আবার বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এত বড় অঙ্কের অর্থায়ন প্রায় অসম্ভব। তাই এসব প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা থেকে ঋণ এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করতে হয়।
- এসব প্রকল্পে অর্থায়ন মাঝে মাঝে কিছু কঠিন শর্তের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়। যেমন- মূলধনী যন্ত্রপাতি যা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হবে তা ঋণ প্রদানকারী দেশ থেকে ক্রয় করতে হবে। এসব শর্তের কারণে বিনিয়োগ সম্ভাবনা কমে যায় এবং প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এসব ঋণের জামানত সরকারকে নিতে হয়। ফলে জনগণের উপর বিশাল অঙ্কের ঋণের বোঝা যুক্ত হয়।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

ফলাফল

- ✓ পিপিপি-এর যৌথ প্রচেষ্টায় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ✓ জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।
- ✓ সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত হয়।
- ✓ কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।
- ✓ পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পায়।
- ✓ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটে।

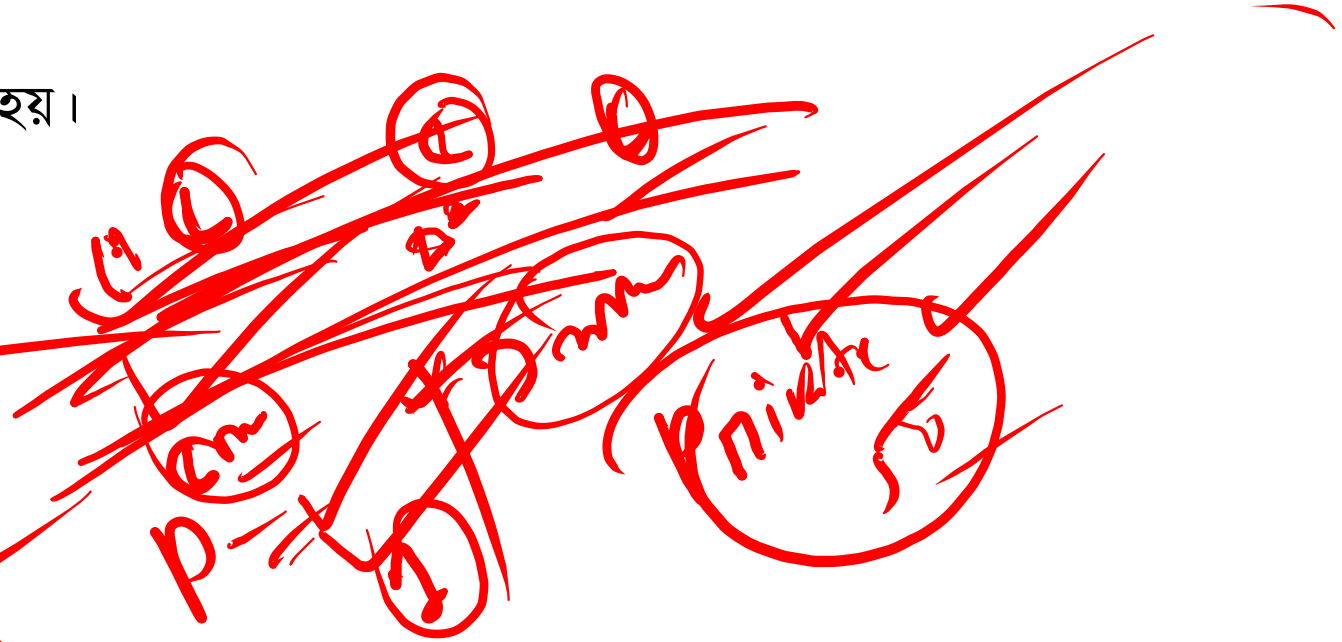

পিপিপির সুবিধা

✓ প্রকল্পের সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে ব্যয়ের পরিমাণকে সমন্বয় সাধন করা। ✓ সম্পদের আয়ুষ্কালের সাথে অর্থের মূল্যের প্রাধান্যতা প্রকাশ করা যায়। ✓ প্রকল্পের সময় ও ব্যয়ের উপর ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক হয়।	✓ পিপিপি এর কারণে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ বেসরকারি অংশীদার নিজের স্বার্থেই সরকারের পক্ষ হয়ে কাজ করে থাকে।

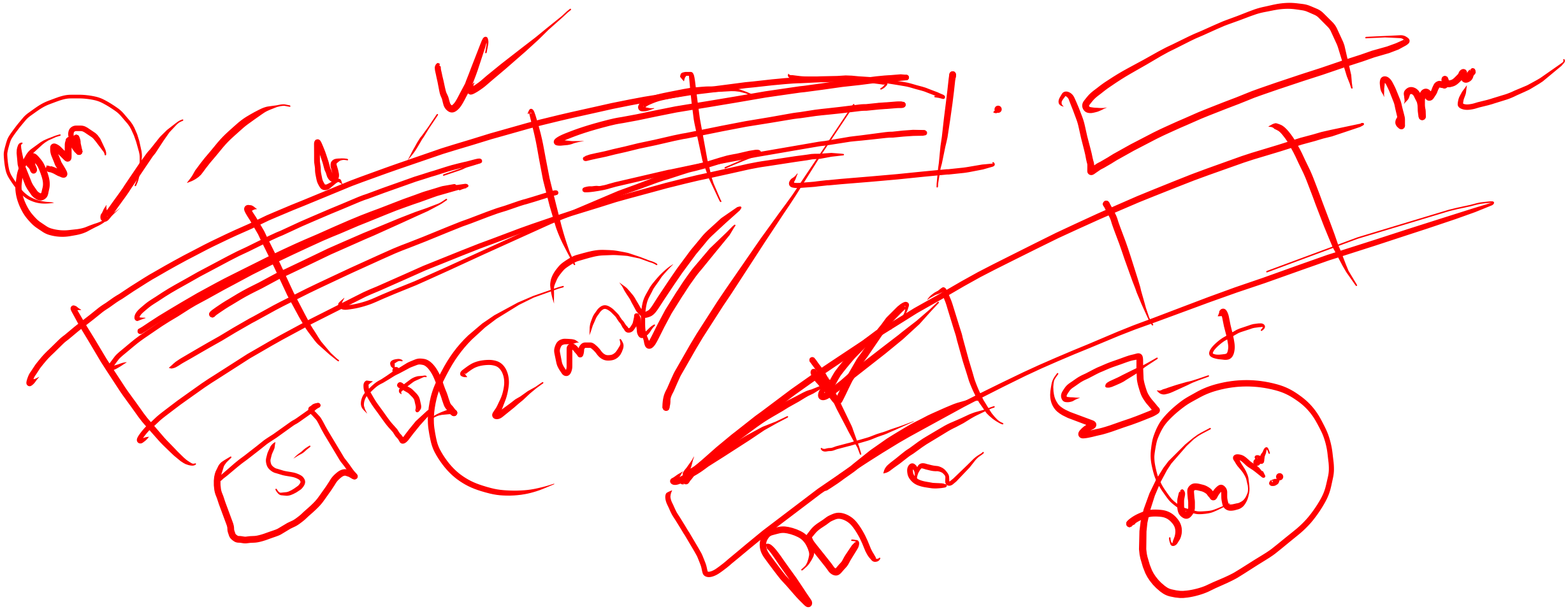

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

অসুবিধা

- ✓ প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য কঠিন হয়।
- ✓ সরকারি কর্মকর্তা যারা চুক্তির সাথে জড়িত, তাদের দৌরাত্ম্যের কারণে বেসরকারি খাত এগিয়ে আসতে চায় না।
- ✓ ব্যবসা ও চুক্তির বিষয়ে সরকারি খাত উদাসীন থাকে ।
- ✓ প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের জন্য মেয়াদভিত্তিক ও সময় সাপেক্ষে বিষয়টি রাজি করানো কঠিন কাজ।
- ✓ সীমিত নমনীয়তা যা বাংলাদেশের মতো দেশে বড় সমস্যা হয় ।

শিল্পনীতি-২০১০ অনুসারে PPP এর মধ্যে যে সকল খাতকে আনা হয়েছে, তা হলো-

✓ সড়ক, রেল, বিমান, নৌ-যোগাযোগ ও বন্দর উন্নয়ন।	✓ পর্যটন খাত উন্নয়ন।
✓ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বালানি খাতের টেকসই উন্নয়ন।	✓ শিল্পপার্ক নির্মাণ ও শিল্পায়ন।
✓ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত।	✓ আবাসন খাতের প্রসার
✓ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাত।	✓ গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আহরণ।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব / PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

PPP এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

PPP এর অধীনে বর্তমানে ৭৬টি প্রকল্প রয়েছে, যার কিছু সংখ্যক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলেও অধিকাংশ প্রকল্পের কাজই চলমান রয়েছে। নিম্নে কিছু প্রকল্পের তথ্য দেওয়া হলো-

- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: বিমানবন্দর থেকে শুরু হয়ে কমলাপুর রেলস্টেশন হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত এই এক্সপ্রেসওয়ে বিস্তৃত। এর মূল অংশের দৈর্ঘ্য ১৯.৭৩ কি.মি। এর প্রকল্প ব্যয় মোট ১২২ বিলিয়ন টাকা।
- মোংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ: এই প্রকল্প ব্যয় ৪১২ কোটি টাকা। এর বাস্তবায়নকাল ছিল ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কিন্তু এখনো সম্পন্ন হয়নি। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বার্ষিক ১.৪০ লাখ কন্টেইনার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক- ২ ও ৫): গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এই হাইটেক সিটি নির্মিত হচ্ছে। যা বাংলাদেশ হাইটেক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক-৩): এটিও গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত। ব্লক-২,৩ ও ৫ এর প্রকল্প ব্যয় মোট ১৬০০ কোটি টাকা।
- ঝিলমিল আবাসন প্রকল্প: ঢাকার কেরানীগঞ্জে এ আবাসন প্রকল্প নির্মিত হচ্ছে। প্রায় ১৬০ একর জমিতে মোট ১৩৭২০ টি ফ্ল্যাট নির্মিত হবে। প্রকল্প ব্যয় ১০০০০ কোটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ছিল ২০১৭-২২ কিন্তু এখনো সম্পন্ন হয়নি।
- ঢাকা বাইপাস সড়ক ৪ লেন করা: মাদারীপুর থেকে গাজীপুরের জয়দেবপুর পর্যন্ত বাইপাস সড়ক চার লেনে উন্নীত করা হচ্ছে।

এছাড়াও মোংলা ইকোনমিক জোন, মিরশরাই ইকোনমিক জোন, আইটি ভিলেজসহ মোট ৭৬টি প্রকল্প বর্তমানে PPP এর অধীনে চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উত্তরণ

নিম্ন আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে বাংলাদেশ আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায়। ১ জুলাই, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক এই তালিকা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাংক মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে। একটি হচ্ছে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, অন্যটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ। বাংলাদেশ এখন থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত হবে। প্রতিবছর ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় অনুসারে দেশগুলোকে চারটি আয় গ্রুপে ভাগ করে। যাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৪৫ ডলার বা তার নিচে, তাদের বলা হয় নিম্ন আয়ের দেশ, বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে এ তালিকাতেই ছিল।

➲ **নির্ধারণের পদ্ধতি:** মূলত ১ হাজার ৪৬ ডলার থেকে শুরু করে যেসব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১২ হাজার ৭৩৬ ডলার, তারা মধ্যম আয়ের দেশের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে আবার আয় ১ হাজার ৪৬ ডলার থেকে শুরু করে ৪ হাজার ১২৫ পর্যন্ত হলে তা হবে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এবং আয় ৪ হাজার ১২৬ ডলার থেকে শুরু করে ১২ হাজার ৭৩৬ ডলার হলে দেশগুলোকে বলা হয় উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ। এর চেয়ে বেশি মাখাপিছু জাতীয় আয় হলে সেই দেশগুলোকে বলা হয় উচ্চ আয়ের দেশ। বিশ্বব্যাংক 'এটলাস মেথড' নামের বিশেষ এক পদ্ধতিতে মাথাপিছু জাতীয় আয় পরিমাপ করে থাকে। একটি দেশের স্থানীয় মুদ্রায় মোট জাতীয় আয়কে (জিএনআই) মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিন বছরের গড় বিনিময় হারকে সমন্বয় করা হয়, যাতে করে আন্তর্জাতিক মূল্যনীতি ও বিনিময় হারের ওঠা-নামা সমন্বয় করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উত্তরণ

➲ **বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৩১৪ ডলার। তবে বিশ্বব্যাংকের পদ্ধতি অনুযায়ী তা এখন ১ হাজার ৪৫ ডলারকে ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই নতুন তালিকায় মধ্যম আয়ের দেশ হতে পেরেছে। বাংলাদেশ সরকারের ১০ বছরের প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার কথা বলা ছিলো। এর আগেই মধ্যম আয়ের দেশ হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলো বাংলাদেশ। নতুন ঐ তালিকায় চারটি দেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের তালিকায় নতুন করে বাংলাদেশের সাথে কেনিয়া, মিয়ানমার ও তাজিকিস্তান স্থান পায়।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ

যে সকল নিম্ন আয়ের দেশসমূহের কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তাদেরকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৬০ এর দশকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে আলাদা একটি ক্যাটাগরি হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টি উপস্থাপিত হয় এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ তার অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে হতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ চিহ্নিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা প্রদান করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিগ্রস্ত এবং পিছিয়ে পড়া দেশসমূহের জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার ব্যবস্থা করা। ১৯৭১ সালে ২৫টি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বর্তমানে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ এ উন্নীত হয়েছে।

➲ **স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণের প্রক্রিয়া:** স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের অর্থ যে সকল দেশ স্বল্পোন্নত দেশের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে আসবে তারা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের মত এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারবে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য যে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদান করা হয় তাদের জন্য সে সাহায্যের প্রয়োজন হবে না বরং তাদের জন্য যে ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে তার চরিত্র হবে ভিন্ন প্রকৃতির মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের পথকে সুগম করার জন্য যে ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তাদের তা প্রদান করা হবে জাতিসংঘের উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটি (সিডিপি) কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে চিহ্নিত করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সরলীকৃত নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছিল। যেমন মাথপিছু জিডিপি, জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান, শিক্ষার হার ইত্যাদি। পরবর্তীতে দীর্ঘ মেয়াদে কাঠামোগত দুর্বলতাসমুহকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে নির্দেশকসমূহে পরিবর্তন আনা হয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশকে চিহ্নিত করার জন্য নিম্নোক্ত নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে।

১. মাথাপিছু জিএনআই (কমপক্ষে ১২৪২ ডলার)
২. মানব সম্পদ সূচক (৬৬ তার অধিক)
৩. অর্থনৈতিক ঝুকিগ্রস্ততা সূচক (৩২ বা তার কম)

প্রতি তিন বছর অন্তর সিডিপি উল্লিখিত নির্দেশকসমূহের আলোকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে মূল্যায়ন করে এবং এর ভিত্তিতে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। একটি এলডিসিভুক্ত দেশ তখনই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয় যখন উপর্যুক্ত তিনটি সূচকের প্রত্যেকটিতেই উত্তীর্ণ হয়। যদি কোন দেশের ৩টি সূচকের মধ্যে দুটিতে অথবা আয় সূচকের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মাত্রার দ্বিগুণ মাথাপিছু আয় হয় তাহলে সে দেশটিকে “Graduate LDC" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

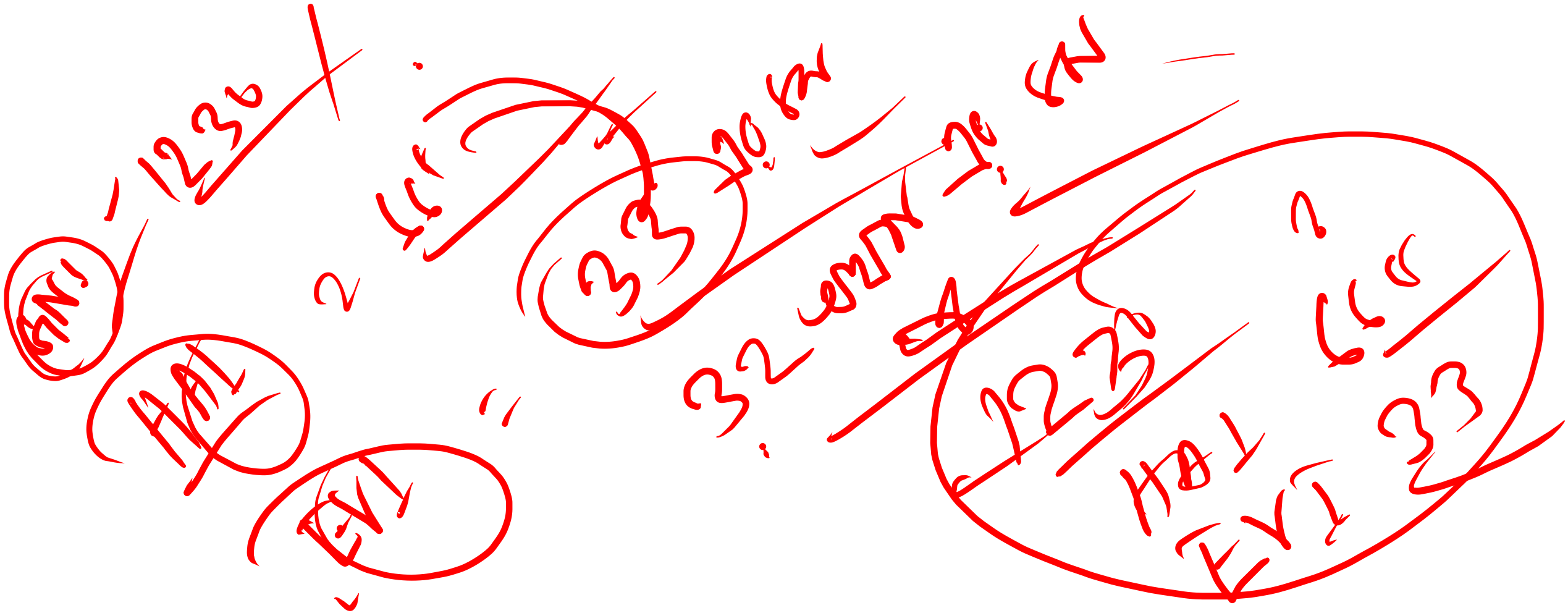

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ

একটি দেশকে স্বল্পোন্নত শ্রেণি হতে বেরিয়ে আসতে হলে সিডিপির পর পর দু'বারে ত্রিবার্ষিক মুল্যায়নে উত্তীর্ণ হতে হবে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক সংস্থা ডেসা (DESA) একটি দেশের স্বল্পোন্নত শ্রেণি হতে বেরিয়ে আসা পরবর্তী অবস্থায় সে দেশের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের সম্ভাব্য অবস্থা এবং জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংস্থা আঙ্কটাড (UNCTAD) সে দেশের অর্থনৈতিক ঝুকিগ্রস্ততার বিষয়টি মূল্যায়ন করে। অর্থনৈতিক ঝুকিগ্রস্ততার বিষয়টি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততা সূচক ছাড়াও আঙ্কটাড অন্যান্য ঝুঁকিগুলোও বিবেচনা করে। এ পর্যায়ে সিডিপি এই সংস্থা দুটোর মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নের এক বছর পূর্বে উক্ত স্বল্পোন্নত দেশের নিকট তাদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিবার্ষিক মুল্যায়নে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল এ সকল প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সিডিপি এর সুপারিশের আলোকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়শীল দেশ বা গ্রাজুয়েট এলডিসি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এ পর্যায়ে সুপারিশপ্রাপ্ত দেশকে তিন বছরের "অন্তর্বর্তীকালীন সময়" প্রদান করা হয় এবং দেশটি তার অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের সাথে আলাপ করে এ সময়ের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন কৌশল প্রণয়ন করে যা অন্তর্বর্তীকালীন সময় পরবর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ

➲ **উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ:** বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এলডিসিভুক্ত হয়। ২০১৫ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু জিএনআই (GNI) ৯২৬ ডলার ছিল যা বর্তমানে প্রায় ১৬০২ ডলারে উন্নীত হয়েছে। স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশ হবার জন্য যে মাথাপিছু জিএনআই প্রয়োজন বাংলদেশের বর্তমান মাথাপিছু জিএনআই তার চাইতে অধিক। উপরন্তু উক্ত ত্রি-বার্ষিক মূল্যায়ন অনুযায়ী বাংলাদেশের মানব সম্পদ সূচকের মান ৬৩.৮ এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততা সূচকের মান ২৫১। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ঝুঁকিগ্রস্ততার সূচকের মানে বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হয়েছে এবং মানব সম্পদ সূচকের মানের খুব কাছাকাছি রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে উন্নয়শীল দেশে উন্নীত হতে সক্ষম হবে যে বিষয়ে দৃঢ় আশার সঞ্চার হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ: উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে সন্দেহাতীতভাবে একটি দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও বৈশ্বয়িক প্রেক্ষাপটে স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যুক্ত হওয়ার অর্থ অধিকতর প্রভাবশালী বলয়ের সাথে সংযুক্ত হওয়া। এ সকল বিষয় আন্তর্জাতিক পরিসরে একটি দেশের ইতিবাচক অবস্থার ইঙ্গিত করে যা উন্নয়শীল দেশে উন্নীত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশর জন্যও প্রযোজ্য। তবে স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করে যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। এ দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে বাংলাদেশের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রভাব পরিলক্ষিত হবে-

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: একটি দেশ যখন স্বল্পোন্নত হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে তখন স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রদেয় বিভিন্ন সুবিধা যেমন বিভিন্ন কর ও কোটা সংক্রান্ত সুবিধাসমূহ উক্ত উন্নয়নশীল দেশের জন্য আর প্রযোজ্য হবে না। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রদত্ত সুবিধার উল্লেখ করা যায়। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন স্বল্পোন্নত দেশের জন্য রুলস অব অরিজিন শিথিল করেছে। বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে তখন বাংলাদেশ আর এ সুবিধা ভোগ করতে পারবেনা। যার নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের রপ্তানিতে পরতে পারে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে জেনারালাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) সুবিধার আওতায় আন্তর্জাতিক বাজারে অভিগম্যতার জন্য শুল্ক হ্রাসের বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে এই সুবিধা পাওয়ার প্রেক্ষিতে শ্রমঘন শিল্পের উপর এর যথেষ্ট ইতিবাচক প্রভাব ছিল, যার ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ জাপান, কানাডা, ভারত এমনকি চীনে পর্যন্ত বাংলাদেশ সহজে বাজার অভিগম্যতার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশ যখন উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে তখন আর এই সুবিধা ভোগ করতে পারবে না।

2032 GSP+

2026

GSP

GSP+

Invest

FDI

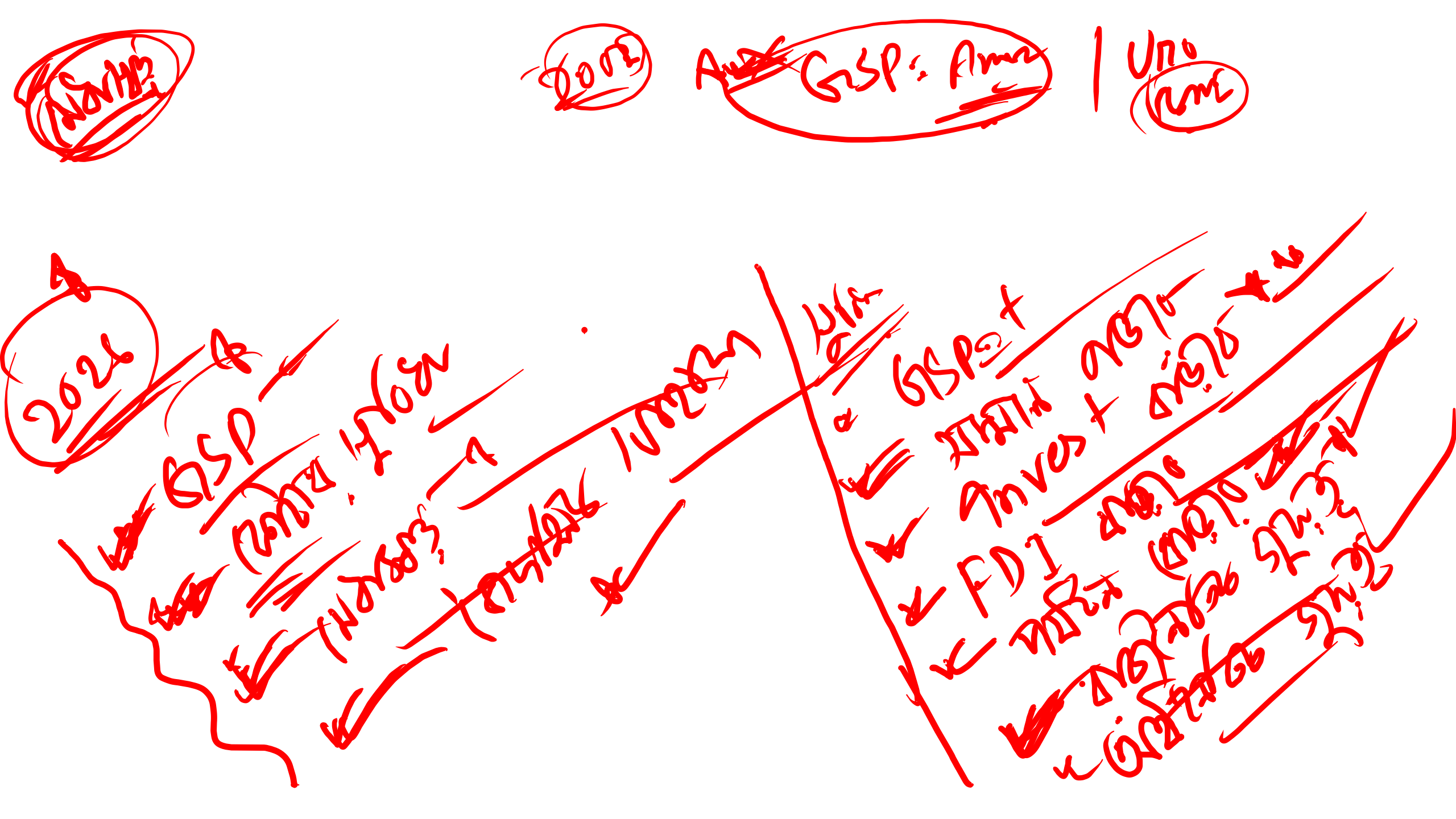

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ

- **উন্নয়ন অর্থায়ন:** অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্স (ওডি) এবং দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তার একটি বড় অংশ (যেমন ওডিএ-এর ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তা এবং দ্বিপাক্ষিক সহায়তার ক্ষেত্রে জাপান ইউকে এইউ প্রদত্ত সহায়তা) এলডিসিভুক্ত দেশসমূহকে প্রদান করা হয়। বিশ্বব্যাংক এ্যাটলাস মেথড এর উপর ভিত্তি করে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশসমূহকে নিম্ন, নিম্ন মধ্যম, উচ্চ মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের দেশের শ্রেণিতে শ্রেণিতুক্ত করে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের শ্রেণিতুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিম্ন আয়ের দেশের শ্রেণিতে ছিল। এর ফলে প্রায় দীর্ঘ ৪০ বছর বাংলাদেশ স্বল্প ও নমনীয় সুদে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ সুবিধা পেয়েছে। সেহেতু বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে উন্নয়শীলদেশভুক্ত হতে যাচ্ছে সেহেতু শুধু বিশ্বব্যাংক নয় দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ে বা স্বল্প সুদে যে ঋণ সুবিধা পেত তা হারাবার আশঙ্কা রয়েছে।

- **প্রযুক্তি:** Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS) এর আওতায় বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ট্রিপস এর ৬৬.২ নং ধারার ভিত্তিতে এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের জন্য সেবা সত্ত্ব সংক্রান্ত শর্তের প্রয়োগ ও প্রতিপালনের বিষয়টি শিথিল করেছে। এর ফলে এ সকল দেশসমূহ এর সুবিধা নিয়ে নিজেদের জন্য প্রযুক্তিগত ভিত তৈরি করতে পারে বিশেষত জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে এর ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। এই সুবিধার আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ জনজীবনের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্যাটেন্টকৃত ঔষধের অনুরূপ ঔষধ দেশে তৈরি করতে পারবে (সাধারণভাবে যা করা বিধিসম্মত নয়) এবং যে সব দেশ এ ধরনের ঔষধ উৎপাদনে সক্ষম নয় সে সব দেশে রপ্তানি করতে পারবে। এই বিশেষ সুবিধা, বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের বিকাশে ও অগ্রগতিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। এলডিসিভূক্ত দেশসমূহের জন্য এ সুবিধার মেয়াদ ২০১৬ পর্যন্ত ছিল যা পরবর্তীতে ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলে এই সুযোগ আর গ্রহণ করতে পারবে না।

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে উত্তরণ

➲ **জলবায়ু পরিবর্তন:** জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় এলডিসিভুক্ত দেশসমূহের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মূল্যায়নের ও সে অনুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই তহবিলের আওতায় এলডিসিভুক্ত দেশের জন্য ঝুঁকিগ্রস্ত খাতসমূহ চিহ্নিত করা হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোজন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব হ্রাসে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত শ্রেণি হতে উত্তরণ করলে এই সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে না।

❖ **ভবিষ্যত সম্ভাবনা এবং অগ্রবর্তী পদক্ষেপ:** এলডিসি হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ইতিবাচক দিকও রয়েছে। এলডিসি থেকে বেরিয়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার অর্থ হলো দারিদ্র্যের কালিমাযুক্ত আত্মমর্যাদাহীন জাতীয় পরিচয় থেকে বেরিয়ে এসে আন্তর্জাতিকভাবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া। সেই সঙ্গে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়া, বৃহত্তর পরিসরে উৎপাদনশীল দক্ষতার পরিচায়ক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর ইতিবাচক পরিবর্তন ও বিকাশের ইঙ্গিত বহন করে। এই উত্তরণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির আভাস দেয়। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রধান করণীয় হবে একদিকে উন্নয়নের গতি তুরান্বিত করা ও এর সুফল সকল স্তরের জনগণের মধ্যে পৌছে দেয়া এবং অন্য দিকে এলডিসি থেকে উত্তরণের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হলে দেশের কোন ক্ষেত্রে কী কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা চিহ্নিত করা। এজন্য বাংলাদেশকে এখন থেকেই দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে বিশেষত আন্তর্জাতিক সহায়তা সঙ্কুচিত হলে কী করণীয় তা নির্ধারণের জন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও রপ্তানি খাতের বৈচিত্র্যময় সম্প্রসারণ করতে হবে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

আধুনিক অর্থশাস্ত্রে জনসংখ্যাকে মানবসম্পদ বা মানব পুঁজিরূপে গণ্য করা হয়। তবে শুধু জনসংখ্যা নয় বরং দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনসংখ্যাকেই বলা হয় মানবসম্পদ। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল জনসংখ্যা বহুল একটি দেশ। এদেশে জনাধিক্য থাকলেও তারা মানবসম্পদ নয়। বরং উন্নয়নের পথে বাঁধা বা অভিশাপ হিসেবে গণ্য। কোনো দেশের জনসংখ্যা আপনাআপনি মানবসম্পদে পরিণত হয় না বরং তাদের মানব সম্পদ রূপে গড়ে তুলতে হয়। আর এ দায়িত্বটি মুখ্যত সরকারকেই পালন করতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৫৮.৭ শতাংশই কর্মক্ষম। বিপুল এ কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। আর তাই বিপুল এ জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে জনভিত্তিক লভ্যাংশ আহরণে বাংলাদেশ সরকার নানা উন্নয়নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আর এ প্রয়াসের ফলাফলও ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

১. বাজেট বরাদ্দ : মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাজেট বরাদ্দ দিয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার ৫১০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ২৮.২৫ শতাংশ; তন্মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ খাতেবরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার ২২২ কোটি টাকা।

২. শিক্ষার উন্নয়ন : মানবসম্পদ উন্নয়নের মূলভিত্তি হিসেবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে বিবেচনা করা হয়। তাই জাতীয় বাজেটে এই দুই খাতকে সর্বদা প্রাধান্য দেওয়া হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৯৪ হাজার ৮৭৫ কোটি টাকা। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৬৪.৫২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকার এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, চাহিদা ভিত্তিক সরকারি ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (৬৪ জেলা), মৌলিক সাক্ষরতাপ্রকল্প (৬৪ জেলা), সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পসহ আরো কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে লেখাপড়া ও হিসাব নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা।

৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন : অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে নানা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৮ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা (মাদ্রাসা শিক্ষাসহ) বরাদ্দ করেছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

৪. স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন : জনগণকে সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জনস্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকার জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২২ মেয়াদে চতুর্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি- ৪) বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ৪৮৬ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। দেশে প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে। করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সংক্রমিত ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১- ২২ অর্থবছরের বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩৫ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

❖ **নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন :** দেশের জনসংখ্যা অর্ধেক নারী। তাই নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ব্যতীত মানবসম্পদ উন্নয়নের যেকোনা চিন্তা নিরর্থক। নারীর কাঙ্ক্ষিত বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে গৃহীত হয়েছে 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন- ২০১০'। শিশু স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে 'জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১' এবং 'বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা-২০১৮'। এছাড়া, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❖ **সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার সফলতা :** বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল ও নানা সমস্যাসঙ্কুল দেশ হলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিক অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষার প্রসার, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এবং মানবসম্পদের উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে আজ বিশ্বাঙ্গনে স্বীকৃতি পাচ্ছে মডেল রাষ্ট্র হিসেবে। মানবসম্পদের উন্নয়ন এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করে সরকার এক্ষেত্রে যে সকল পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে বা করছে তার সাফল্যের ফলাফলও ইতোমধ্যে আমরা দেখতে শুরু করেছি। সরকার গৃহীত এসব পদক্ষেপের সমন্বিত ফলাফলের সাফল্যেই আজ বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে এবং নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের দ্বারপ্রান্তে। মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের সফলতা নিম্নে তুলে ধরা হলো

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

১. একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম একটি সুশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ী, দক্ষ ও বিজ্ঞানমনস্ক মানবসম্পদ তৈরির কৌশল হিসেবে সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে এসেছে গুণগত পরিবর্তন, সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪.৪ শতাংশে এবং বিদ্যালয়ে নীট ভর্তি হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.৩৪ শতাংশ।

২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও দক্ষ জনশক্তি বিকাশে সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের ফলে দেশের উৎপাদন খাতে যেমন এর সুফল আসতে শুরু করেছে তেমনি বিদেশে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির পরিমাণও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. শিক্ষায় আইসিটি কার্যক্রম ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে সরকার তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ একটি জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ফলস্বরূপ দেশে ও বিদেশে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর খাতে বাংলাদেশিরা আজ সুনামের সাথে কাজ করছে। আউটসোর্সিং এর মত পেশায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের প্রধান সারির একটি দেশ।

৪. সরকারের গৃহীত জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের ফলে কমেছে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার, উন্নত হয়েছে পুষ্টি পরিস্থিতি। দারিদ্র্যের হার কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের দারিদ্র্যের হার ৬৪ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশে।

৫. সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে দেশে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশের নারীদের একটি বড় অংশ গৃহে আবদ্ধ সাংসারিক কর্মকাণ্ডের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে উৎপাদনশীল কাজে যুক্ত হয়েছে। দেশের জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান রাখা তৈরি পোশাক শিল্পের ৯০% শ্রমিকই নারী।

সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের যে নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে তার ফলস্বরূপ বিশ্ব মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ দিন দিন উন্নতি করছে। মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী, বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে ১৩৩তম। ২০১৯ সালের রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৫তম। সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা- ৭২, মালদ্বীপ- ৯৫, ভুটান- ১২৯, ভারত- ১৩১, নেপাল- ১৪২, পাকিস্তান- ১৫৪ এবং আফগানিস্তানের অবস্থান- ১৬৯তম। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সাফল্যের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছে বাংলাদেশ। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড- ২০১৯';
- নারী শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে নেতৃত্বদানের জন্য 'উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড- ২০১৮';
- নারীর ক্ষমতায়নে সাফল্যের জন্য এজেন্ট অব চেঞ্জ এবং প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার- ২০১৬ লাভ করেন।
- স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী দুইবার (২০১১ ও ২০১৩) সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন।

সামাজিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হলে তাদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। এই জনসংখ্যাকে মানবসম্পদে পরিণত করতে শিক্ষার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব। দেশের উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে এই জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুসারে, দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৪ শতাংশ এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের অনুপাত ৪৯.২৫ ও ৬৮। সুতরাং মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা যে অপরিহার্য একথা স্মরণ রেখেই সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে এক নম্বর যোগ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং নিচ্ছে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আশা করা যায়, এতে দেশের জনসংখ্যা অচিরেই মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়ে দেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- মেগা প্রকল্প কী? [৪৪তম বিসিএস]
- পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেমের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যৎ চিত্র অঙ্কন করুন। [৪৪তম বিসিএস]
- বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বাংলাদেশের মেগা প্রকল্পসমূহ কী কী? [৪৩তম বিসিএস]
- পিপিপি (PPP)-এর আওতায় এ পর্যন্ত সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকল্পগুলো কী কী? [৪৩তম বিসিএস]

টিকা

- গভীর সমুদ্রবন্দর। [৪৪তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্ব। [৩৫তম, ৩১তম ও ২৯তম বিসিএস]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কীভাবে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়? দৃষ্টান্তসহ বর্ণনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- মানবসম্পদ বলতে কি বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস]
- 'দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক'- আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস]
- দারিদ্র্য বিমোচন বলতে কি বুঝায়? [৩৭তম বিসিএস]
- দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশে সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [৩৭তম বিসিএস]
- পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন বলতে কী বুঝেন? [৩৬তম বিসিএস]
- মেট্রোরেল প্রকল্পের সম্ভাবনা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস]
- বাংলাদেশের গত পাঁচ বছরের ধারাবাহিক মোট দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র বিবরণ দিন। [৩৫তম বিসিএস]
- রেমিট্যান্স খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী অবদান রাখছে? [৩৫তম বিসিএস]

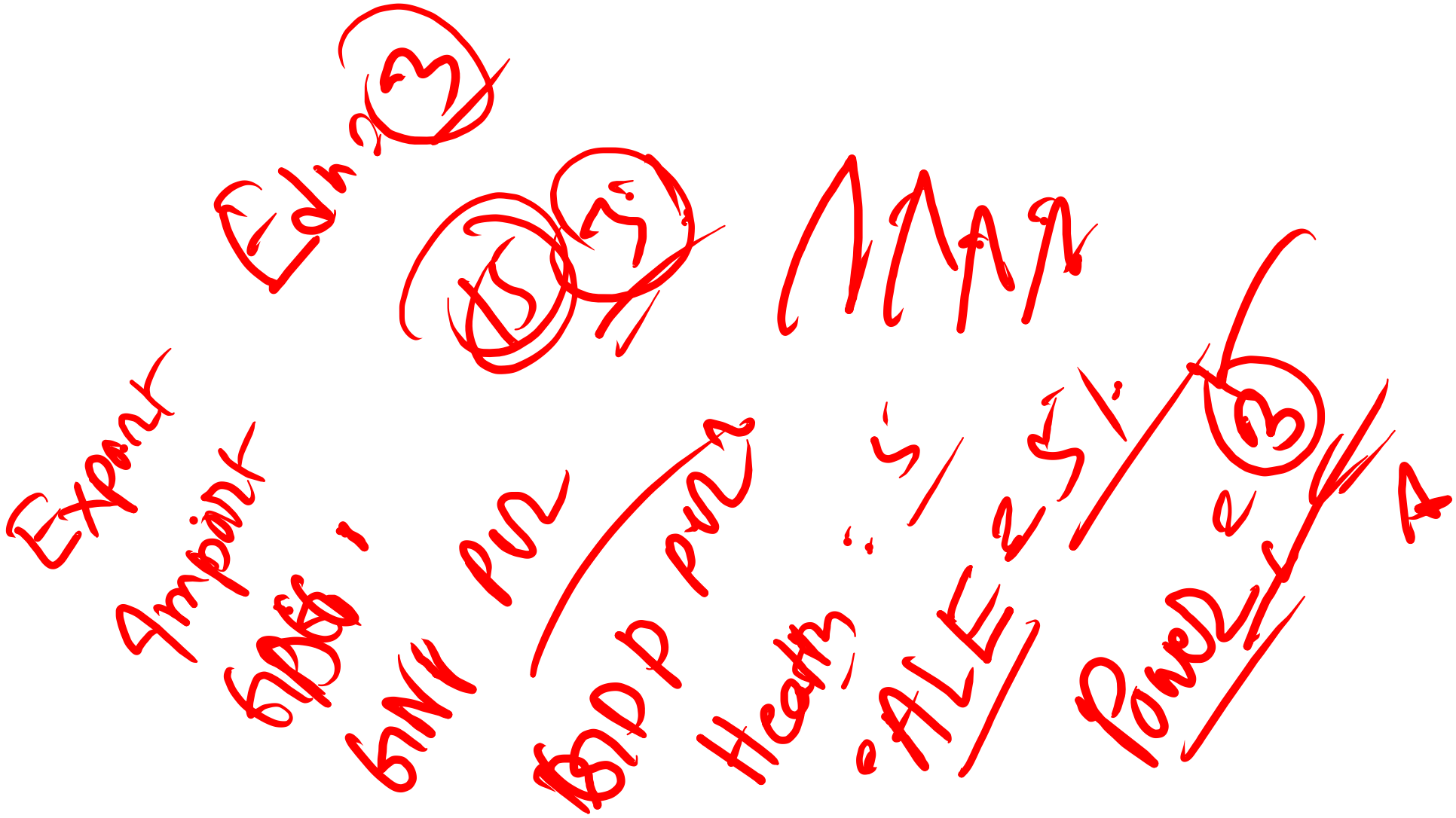

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- মধ্যম আয়ের দেশ বলতে কী বুঝায়? মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে কিভাবে গড়ে তোলা যায়। [৩২তম বিসিএস]
- দারিদ্র্য বিমোচন বলতে কী বুঝায়? এ বিষয়ে বাংলাদেশের সাফল্য বা ব্যর্থতা বর্ণনা করুন। [৩২তম বিসিএস]
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স আয় বর্ধনে বাংলাদেশের বর্তমান সাফল্য এবং তা ধরে রাখার জন্য ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের চিত্র তুলে ধরুন। [৩১তম বিসিএস]
- GDP ও GNP এর মধ্যে পার্থক্য কী? [২৭তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

09666775566
www.uttoron.academy